পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১৯ ।। সংখ্যা ২৬ ।। ৩ জানুয়ারী ১৯৮৬ ।। ১৮ পৌষ ১৩৯২



লোক-সংস্কৃতি দ্বিতীয় রাজ্য উৎসব '৮৬
বিশেষ সংখ্যা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



গত ২২ ডিসেম্বর ৮৫ লবণ হ্রদের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন কলিকাতার মেয়র শ্রীকমল বসু, ছবিতে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীকেও দেখা যাচ্ছে।

ছবি ঃ অজিত দাস।

পশ্চিমবঙ্গ

৩ জানুয়ারি ৮৬

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে   বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।

ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময়ের জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক
প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়সূচি

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ—শ্রীতারাপ্রসাদ দাস

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৯ ।। সংখ্যা ২৬ ।। ৩ জানুয়ারি ১৯৮৬ ।। ১৮ পৌষ ১৩৯২

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আদর্শের ভিত্তিতে লড়াই করতে হবে

□ বিশেষ নিবন্ধ :
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কয়েকটি দিক
শ্রী দীপ্তেশ রায় □

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিজ্ঞান প্রদর্শনী উদ্বোধন করে কলিকাতার মেয়রের আহ্বান

গত ২২ ডিসেম্বর '৮৫ যুবভারতীর ক্রীড়াঙ্গনে বিড়লা শিল্প ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালার সহযোগিতায় রাজ্যের যুবকল্যাণ বিভাগ আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী এক বিশাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে কলকাতার মেয়র শ্রী কমল বসু বলেন, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যুবকদের আদর্শের ভিত্তিতে লড়াই করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের দেশে কম সুযোগের মধ্যেও বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে এবং বিদ্যালয়স্তর থেকেই হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসাও ফুটে উঠছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শ্রী সন্তোষ সরকার বলেন, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটলেও গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এখনও কুসংস্কারের বীজ নিহিত রয়েছে। বিজ্ঞানের আলোতে এই মানুষদের সংস্কারমুক্ত করতে হবে এবং যুবক-যুবতীদের তিনি এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।



বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের মডেল

এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে স্কুল কলেজ এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে এসেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ প্রতিনিধি এসেছেন ৭৫ টি মডেল নিয়ে। এর মধ্যে ৬৭ টি স্কুল ৮৬ টি ক্লাব, ১০ টি কলেজ, এবং ১২ টি আমন্ত্রিত সংগঠন প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। আমন্ত্রিত হয়ে যারা প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিবপুর বি ই কলেজ,নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি। বিভিন্ন আকর্ষণীয় মডেল ছাড়াও এখানে টেলিস্কোপের মাধ্যমে রাতের আকাশ, মডেল জাহাজ এবং এ্যারোপ্লেন উড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। খাদ্য এবং পুষ্টির বিভিন্ন তালিকা, হ্যালির ধূমকেতু ছাড়াও এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ প্রশ্ন, ফেলে দেওয়া কলা গাছের খোসা থেকে কাগজ, আটা, জ্বালানী গ্যাস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী। একই মেসিন চালিয়ে কাঠ চেরাই ও ফুটো করা, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ইত্যাদি তৈরি করে দেখানো হচ্ছে। কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রও দেখানো হয়েছে এখানে। আর ছিল গ্রাম-শহরের উন্নয়নের পরিকল্পনা। বহু দর্শক কদিন ধরে এই প্রদর্শনী দেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ২৯ ডিসেম্বর প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই ধরনের আরো অনেক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত।

আলোচনাচক্র

সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে দেশে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার প্রয়োজন। মতান্ধতা, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করার কাজে বৈজ্ঞানিকদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশের অগণিত অভুক্ত মানুষের প্রকৃত সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে। এই উপলক্ষে আয়োজিত 'বিজ্ঞান ও সমাজ' শীর্ষক আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা একথা বলেন। আলোচনায় অংশ নেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি শ্রীজয়ন্ত বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সন্তোষ সরকার, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়র ফিজিক্সের ডঃ সুবিমল সেন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার।

শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, আজ বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আলোচনার শুরুতে আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে দেশের প্রকৃত অবস্থাটা কি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মানুষের চাহিদাটা কতখানি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ মোটরগাড়ি ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এ কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন। অতএব এদেশের পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করেই বিজ্ঞানকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করবো তা স্থির করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের মানুষের কি প্রয়োজন তা না বিচার করে, বিজ্ঞানকে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্তী বলেন, দেশের বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ আজ বিদেশে চলে যাচ্ছেন। দেশের কথা তাঁরা চিন্তা করছেন না। তিনি বলেন, আই আই টি'র একজন ছাত্র পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই খরচ বহন করেন দেশের মানুষই। অথচ পাশ করার পর বিজ্ঞানীরা বিদেশে চলে যান।

শ্রীচক্রবর্তী বলেন, গ্যালিলিও ব্রুনো, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সত্যের সপক্ষে প্রগতি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। মতান্ধতার কাছে মাথা নত করেননি। তাঁদের এই দৃষ্টান্ত আজও আমাদের প্রেরণা। বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে এই প্রেরণা আরো লক্ষ বছর টিঁকে থাকবে।

অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত বলেন, অসাধারণ মানুষের সাধারণ জ্ঞান থেকেই বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে 'বিজ্ঞান' শব্দটির কোন ব্যবহার ছিল না। কিন্তু প্রাচীন যুগের এশিয়া, আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে প্রমাণ হয় যে মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতা ছিল। কিন্তু নানারকম ঐতিহাসিক কারণে এইসব দেশের বিজ্ঞানচাপা পড়ে গেছে। আজকের দিনে বলা হয় যে, ইউরোপের বিজ্ঞানইএকমাত্র বিজ্ঞান। দত্তগুপ্ত বলেন, নানারকম অপসংস্কারের জন্যই এসব দেশে বিজ্ঞানের প্রসার হয়নি। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ আজও নানারকম কুসংস্কার মেনে চলেন। সমাজকে যদি বদলাতে হয় তবে মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে হবে।

ডঃ সুবিমল সেন বলেন, বিজ্ঞানের পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গেই যুক্ত। কোন একটা প্রয়োজন থেকেই যেমন একটা বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়, তেমনি সেই প্রয়োজনের অবস্থাটা সৃষ্টি করে একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থা। দাসযুগ থেকে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ, এর প্রতিটি উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উত্তরণ হয়েছে। তিনি বলেন, এদেশে আজও যে এত কুসংস্কার রয়েছে, তার কারণ এদেশ থেকে সামন্ততন্ত্র নির্মূল হয়নি।

অধ্যাপক রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার বলেন, আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি লড়াই চালায় খুব কম ক্ষেত্রেই। তাদের হাতিয়ার হলো জ্ঞানের সাম্রাজ্যবাদ বা নলেজ ইম্পিরিয়া-লিজম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি তারা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রেখে দিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলাতে হবে।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফলাফল

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র, নানুর বিধানসভা (তফসিলী) কেন্দ্র এবং অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনগুলির বিস্তৃত ফলাফল নিম্নরূপ

৪১ নং বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র

প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সি.পি.আই.এম)	৩,৩৯,০৭৮ (নির্বাচিত)
২। শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় (আই-এন-সি)	২,৪০,০৭৯
৩। শ্রীকমলাকান্ত রায় (নির্দল)	১০,০৮৭
৪। শ্রীমদেশ্বর হোসেন (নির্দল)	৪,১৮২
৫। শ্রীনারায়ণচন্দ্র মণ্ডল (নির্দল)	২,২৪৫
মোট	—৫,৯৫,৬৭৬

মোট ভোটারের সংখ্যা ৭,৮৫,১৭৫ (সার্ভিস ভোটার ৫৯০ সহ), মোট বৈধ ভোট ৫,৯৫,৬৭১ মোট বাতিল ভোট ১১,৮৪৮, মোট ভোট ৬,০৭,৫১৯, টেন্ডার ভোট ৬২। ডাঃ শরদীশ রায়ের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল।

২৮৩ নং নানুর বিধানসভা কেন্দ্র (তফঃ)

প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট
১। শ্রী আনন্দগোপাল দাস (সি.পি.আই.এম)	৪৭,৩৩৪ (নির্বাচিত)
২। শ্রী অধীরকুমার সাহা (আই-এন-সি)	৩৭,৩৬৮
৩। শ্রী রাম হাজরা (নির্দল)	১,২৯৪
৪। শ্রী নীলকান্ত হাজরা (নির্দল)	৬২৭
মোট	—৮৬,৬২৩

মোট ভোটারের সংখ্যা ১,১২,৩০০ (সার্ভিস ভোটার ১৫১ সহ), মোট বৈধ ভোট ৮৬,৬২৩, মোট বাতিল ভোট ২,২২০, মোট ভোট ৮৮,৮৪৩, টেন্ডার ভোট ১৬।

শ্রী বনমালী দাস (সি. পি. আই.এম) দল ত্যাগ এবং বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করলে এই আসনটি শূন্য হয়েছিল।

অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র

অরঙ্গাবাদ বিধানসভায় আই-এন-সি (অর্থাৎ কং-ই) প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রী হুমায়ুন রোজা আই-এন-সি পেয়েছেন ৪০,৪৭৭টি ভোট।

শ্রী তোয়াব আলি সি-পি-আই(এম) পেয়েছেনঃ ৩৯,৩৪৪টি।

আসনটি আই-এন-সি'র দখলে ছিল।

রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব ও যাত্রা উৎসব

বিগত আট বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়ণে, ইতিমধ্যেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। নির্বাচনে জয়লাভের পর, প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সূচনাপর্বেই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে, অপসংস্কৃতির স্রোতের বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও নবনব সৃজনের জোয়ার সৃষ্টিতে, সকলের উদ্দেশে আহ্বান জানান এবং নতুন সংস্কৃতি বিভাগ গঠন করেন। এটা শুধু সরকারি বিভাগের লোকদেখানো পুনর্গঠন ছিল না, এটা ছিল প্রকৃতই সংস্কৃতির অঙ্গনে নতুন নতুন ফুল ফোটানোর উদ্যোগ। শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, নাগরিক সংস্কৃতি তথা লোক বা গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কর্মসূচিকে সেইদিন থেকে প্রসারিত করা হয়। ইতোপূর্বে এরাজ্যে সংস্কৃতির জগতে কোন সরকারি নীতি ছিল না, ছিল না সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোন মূল্যায়ন বা নবনব সৃষ্টির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা। নবজাগরণের ধারাবাহী এবং গ্রামীণ বাংলায় শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্টিবাহী যে সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য অনুসারী অনুসন্ধান ও পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে, এখানে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মহোৎসব। ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্রচর্চা সহ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নিবিড় অনুশীলন আমাদের পাথেয়। বাংলার সমৃদ্ধ সাংগীতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণসহ নতুন সৃষ্টির সম্ভার গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি। সারা ভারতে বাংলার নাট্যচর্চার সুমহান অবদানকে অব্যাহত রাখার দৃষ্টিতে সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক নাট্য সৃষ্টিকে নানাভাবে শুধু উৎসাহিত করা হচ্ছে তাই নয়, একটি আকাদেমি বা জাতীয় নাট্য সংস্থা গড়ে তুলে নাটকের সার্বিক চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়াস চলছে। নির্মিত হচ্ছে চারুকলার স্থায়ী প্রদর্শনশালা যা এ রাজ্যে অভিনব। চলচ্চিত্রে পশ্চিমবঙ্গ সারা বিশ্বে প্রথম সারিতে এবং এ গৌরবে সরকার নির্মিত চলচ্চিত্রের অংশ সিংহভাগ। কলকাতার বুকে গঠিত হয়েছে সর্বাত্মসাধক চলচ্চিত্র কেন্দ্র 'নন্দন' যার সমকক্ষ সমগ্র বিশ্বে মাত্র দু'একটিই আছে। সীমিত আর্থিক সামর্থে বামফ্রন্ট সরকারের এ এক শীর্ষস্থানীয় কৃতিত্ব। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষা ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি এরাজ্যে কোন সরকার ইতোপূর্বে দৃষ্টি দেয় নি। বামফ্রন্ট সরকার উর্দু আকাদেমি, নেপালী আকাদেমি, কয়েকটি উপজাতি চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করে সমস্ত সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নকল্পে ইতোপূর্বে কোন সরকারি প্রয়াস হয়নি। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বাংলা আকাদেমি গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেই অভাব পূরণ করতে চলেছে।

এমন অজস্র কর্মকাণ্ডের তালিকায় রয়েছে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী কালজয়ী ধারাগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসসমূহ। আমরা মনে করি শুধু অর্থনীতি ক্ষেত্রে নয়, সংস্কৃতির ভূমিতেও প্রাণ-ভ্রমরার সন্ধান করতে হবে বাংলার মাঠে ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে। প্রাণ চাঞ্চল্যের রোশনাই হয়তো রয়েছে নগর কলকাতায় কিন্তু তার হৃৎপিন্ড গ্রামাঞ্চলে, সেখান থেকেই পরিশ্রুত রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে সারা রাজ্যের শরীরে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। তাই শ্রমজীবী মানুষের কর্মে ঘর্মে পুষ্ট লোকশিল্পের অজস্র সম্পদ থেকে উদারভাবে গ্রহণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির অগ্রগতির প্রধান চাবিকাঠি, ধনবাদী অবক্ষয়ী অপসংস্কৃতির অনুকরণের মধ্যে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বামফ্রন্ট সরকার পর্যায়ক্রমে মহকুমা, জেলা, বিভাগ ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকসংস্কৃতির সৌন্দর্য ও সুষমা মণ্ডিত সম্পদসমূহকে চয়ন করে লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করে আসছে বিগত সাত-আট বছর ধরে। দ্বিতীয় রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ থেকে ৮ জানুয়ারি '৮৬ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে। ৪ জানুয়ারি দেশপ্রিয় পার্ক থেকে রবীন্দ্রসদন নাগরিক ও গ্রামীণ শিল্পীদের এক সংহতিমূলক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হবে। পশ্চিমবঙ্গের পনেরোটি জেলার লোকনৃত্য-গীত-নাট্য-রাজ্যের প্রায় চারশত শিল্পী এতে অংশ নেবেন। কলকাতা মহানগরীতে লোকশিল্পীদের এটি একটি বৃহৎ সমাবেশ।

লোক সংস্কৃতি রাজ্য উৎসব এবং যাত্রা উৎসবকে জনগণের উপস্থিতিতে সফল করে তুলুন

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকারের আবেদন

লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রতি বামফ্রন্ট সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৮০ সন থেকে প্রতিটি জেলা, প্রতিটি বিভাগে পর্যায়ক্রমে দু'টি করে উৎসব হয়ে গিয়েছে। রাজ্যস্তরে কলকাতায় ১৯৮২-তে একবার উৎসব হয়েছে। এই ৩৭ টি উৎসবে কয়েকহাজার লোকশিল্পী অংশ নিয়েছেন। এই উৎসবগুলিতে লোকনৃত্য-গীত-নাট্য-বাদ্য এবং শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। লোকশিল্পীরা উৎসাহিত হচ্ছেন, তাঁদের মর্যাদা, গৌরব ও সংহতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসংগঠিত শিল্পীরা সংগঠিত হতে আরম্ভ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে নতুন আলোড়নের সামগ্রিক পটভূমিতেই এগুলি ঘটছে।

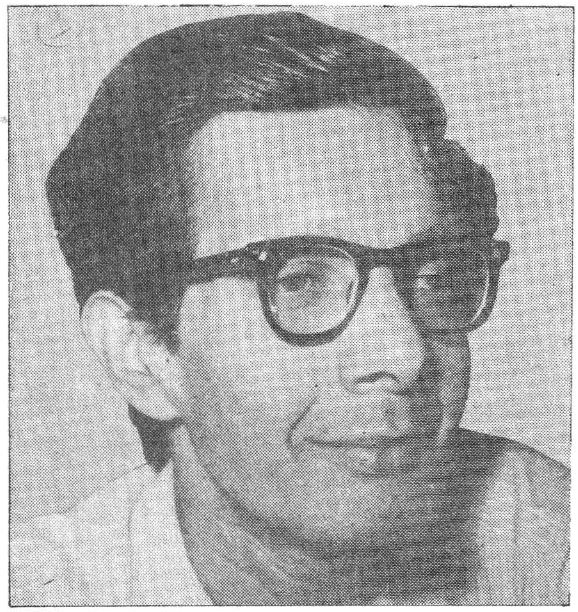
পাঁচদিন ধরে উৎসবে পনেরটি জেলার লোকশিল্পীরা লোকনৃত্যগীত নাট্য ও বাদ্যের প্রায় ৫৩ টি বিষয় পরিবেশন করবেন। এঁদের পরিবেশিত নৃত্যগীত ও নাট্য বাদ্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যাবে। উৎসবের সঙ্গে লোকনাট্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। লোকনাট্যের ১৬ টি বিষয় এখানে আলোচিত হবে। ব্যাপক আকারে রাজ্যস্তরে এ ধরনের আলোচনা সভা এই প্রথম বলে মনে হয়। এর আগে তিনটি বিভাগে লোকনাট্যের ওয়ার্কশপ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া লোকশিল্পের প্রদর্শনী থাকছে।

লোকনৃত্য গীত নাট্য বাদ্য ও শিল্প দেশের অমূল্য সম্পদ। এর বিকাশ ও প্রসার হওয়া দরকার। তার জন্য রাজ্য সরকার বেহালায় লোকশিল্পের একটি সংগ্রহশালা, লোকসাহিত্যের একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে। একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। দুঃস্থ লোকশিল্পী এবং সংস্থাগুলি আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছেন। এরই পাশাপাশি সিউড়ি, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং আলিপুরদুয়ারে চারটি আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

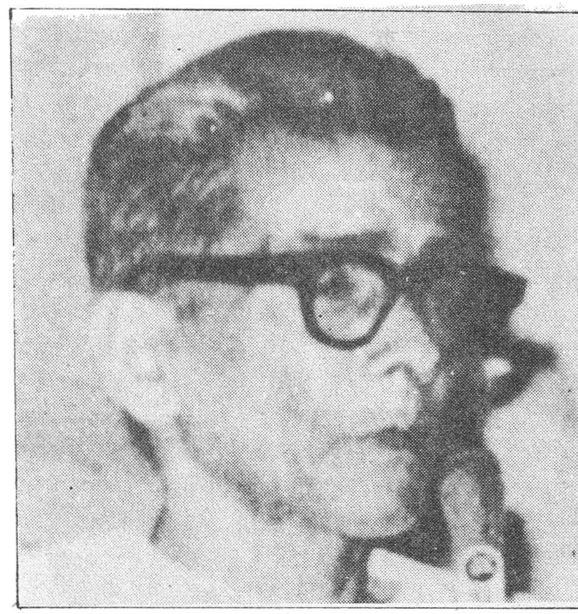
লোকশিল্পের বিরাট বৈচিত্র্যের ধারায় গড়ে ওঠা অন্যতম আঙ্গিকে বাংলা যাত্রা সম্পর্কে সরকারকে সমানভাবে উৎসাহী। গ্রামে গ্রামে আজও কোথাও বৈদ্যুতিক আলোয়, কোথাও পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে যাত্রার আসর নিয়মিত বসে। সঙ্গীত, নৃত্য, কথকতা পাঁচালী, কবিগান, তরজার পাশাপাশি যাত্রার চর্চা ও জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত শুধু নয় ক্রমবর্ধমান। বাণিজ্যিক জগতেও যাত্রা আজ বিপুলভাবে আসর জমিয়েছে। এমন একটি

(শেষাংশ ৫৮৩ পৃষ্ঠায়)

লোকসংস্কৃতির দ্বিতীয় রাজ্য উৎসবের শ্রদ্ধা নিবেদন



লোকসংস্কৃতি পর্ষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য
প্রয়াত লোকসংস্কৃতিবিদ অরুণ রায়



লোকসংস্কৃতি পর্ষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য
প্রয়াত লোককবি নিবারণ পণ্ডিত

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে

লোক সংস্কৃতির উৎসব ১৯৮০–'৮৫

১৯৭৯–৮০ □ বিভাগীয় উৎসব

বর্ধমান বিভাগ ঃ পুরুলিয়া শহর, ১৪, ১৫, ১৬ মার্চ, ১৯৮০ □ **প্রেসিডেন্সি বিভাগ ঃ (মালদহ জেলাসহ)** বহরমপুর, ৪, ৫, ৬ এপ্রিল ১৯৮০ □ **জলপাইগুড়ি বিভাগ ঃ** জলপাইগুড়ি শহর, ১২, ১৩, ১৪ এপ্রিল ১৯৮০

১৯৮০–৮১ □ জেলা উৎসব

মেদিনীপুর ঃ চন্দ্রকোণা, জিরাট হাই স্কুল, ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **পুরুলিয়া ঃ** বলরামপুর, ফুলচাঁদ হাইস্কুল, ১৩, ১৪, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **বাঁকুড়া ঃ** বাঁকুড়া, জেলা স্কুল, ২৭ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ ১৯৮১ □ **বীরভূম ঃ** কির্ণাহার হাইস্কুল, লাভপুর, ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **হুগলী ঃ** আরামবাগ, ৭-৯ মার্চ ১৯৮১ □ **বর্ধমান ঃ** কাটোয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি--৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **জলপাইগুড়ি ঃ** ফালাকাটা, ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **কোচবিহার ঃ** কোচবিহার, রাম ভোলা হাইস্কুল, ২০-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **দার্জিলিং ঃ** কালিংপং □ **পশ্চিমদিনাজপুর ঃ** মঙ্গলপুর, বালুরঘাট, ১৬-২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ □ **মালদা ঃ** মানিকচক ২৮, ২৯, ৩০ মার্চ ১৯৮১ □ **২৪ পরগনা ঃ** বনগাঁ ৬-৮ মার্চ ১৯৮১ □ **হাওড়া ঃ** কালিবাড়ি, উলুবেড়িয়া, ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **নদিয়া ঃ** কৃষ্ণনগর, টাউন হল ময়দান, ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ □ **মুর্শিদাবাদ ঃ** লালবাগ ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

১৯৮১-৮২ □ রাজ্য উৎসব

কলকাতা ঃ ১১-১৫ মার্চ ১৯৮২

১৯৮২-৮৩ □ জেলা উৎসব

মেদিনীপুর ঃ বেলদা, ২৫, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **পুরুলিয়া ঃ** পুরুলিয়া শহর, ২৯, ৩০ মার্চ ১৯৮৩ □ **বাঁকুড়া ঃ** বেলেতোঁড়া, ২৯, ৩০ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **বীরভূম ঃ** পাইকর, ১৯, ২০ মার্চ ১৯৮৩ □ **বর্ধমান ঃ** ভাতাড়, ৬, ৭ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **জলপাইগুড়ি ঃ** ধুপগুড়ি, ৮, ৯, ১০ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **কোচবিহার ঃ** মাথাভাঙ্গা, ৩১ মার্চ-১ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **দার্জিলিং ঃ** শিলিগুড়ি, ১৬, ১৭ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **পশ্চিম দিনাজপুর ঃ** হেমতাবাদ, ৯, ১০ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **মালদহ ঃ** গাজোল, ১০, ১১ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **২৪ পরগনা ঃ** ডায়মণ্ডহারবার, ১১, ১২ জুন ১৯৮৩ □ **হাওড়া ঃ** পানিয়াড়া, পাঁচলা, ৯, ১০ এপ্রিল ১৯৮৩ □ **নদীয়া ঃ** বড় আন্দুলিয়া, ৩, ৪ জুলাই ১৯৮৩ □ **মুর্শিদাবাদ ঃ** রঘুনাথগঞ্জ, ১৯, ২০ মার্চ ১৯৮৩

১৯৮৩-৮৪ □ বিভাগীয় উৎসব।

বর্ধমান বিভাগ ঃ মেদিনীপুর, ১৭, ১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ □ **জলপাইগুড়ি বিভাগ ঃ** কোচবিহার শহর, ২১, ২২, ২৩ মার্চ ১৯৮৪ □ **প্রেসিডেন্সি বিভাগ ঃ** কৃষ্ণনগর [নদিয়া], ২৮, ২৯, ৩০ এপ্রিল ১৯৮৪

১৯৮৪-৮৫ □ রাজ্য উৎসব [স্থগিত রাখা হয়]

লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে জনগণের উদ্যোগ বৃদ্ধি প্রয়োজন

শ্রী সুধী প্রধান

পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার লোকসংস্কৃতি চর্চা এবং বিকাশে যে সামান্য উন্নতি করতে পেরেছে নানা কারণে তার তাৎপর্য আজও বামফ্রন্টের সর্বস্তরের মানুষের কাছেও হয়তো সুস্পষ্ট হয় নি। অনেকে হয়ত ভাবেন এটা একটা নির্বাচনী কৌশল, কারও কারও আশংকা পুনরুজ্জীবনের নামে পুরানো কুসংস্কারগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আবার অনেকের ধারণা, আধুনিক যন্ত্রভিত্তিক সংস্কৃতির সামনে গরিব, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের সেকেলে যন্ত্র, জাঁকজমকহীন সাজ-পোশাক এবং বৈচিত্রহীন নৃত্য-গীত-অভিনয় প্রভৃতির দর্শনের মূল্য কতটুকু। এই ধরনের মন্তব্য বা সমালোচনা কেবল শিক্ষিত লোকেদের কাছ থেকে শুনেছি এমন নয়, প্রশাসনেরও নানা স্তরে মানুষের কাছ থেকে শুনেছি।

আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্য ছাড়াও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসন দ্বারা এমনই ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে করে আমরা গ্রামের মানুষের আত্মিক চাহিদা ও প্রকাশকে ছোট করে দেখতে শিখি এবং ব্যবসায়ী সংস্কৃতির চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত হয়ে ভুলে যাই যে, ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির মহান নিদর্শনগুলির উপর গ্রামের প্রভাব অপরিসীম। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সামান্য কিছু লোকের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর সমাজতান্ত্রিক জগতের তুলনায় পশ্চিমে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেক বেশি পরিমাণে এদেশের শিক্ষিত লোকের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সঙ্গে অগ্রসর কলাকৌশলে পরিচয়ও যেমন তেমনি যন্ত্রভিত্তিক সংস্কৃতির পরিচয়। ফলে শহরের সঙ্গে গ্রামের মানুষের মানসিক বিভেদ আরও বাড়ছে। অথচ সকল দলের কিছু কিছু চিন্তাশীল মানুষ সিনেমা, বেতার ও টিভি মারফৎ ব্যবসায়ীরা যে অপ-সংস্কৃতি প্রচার করছে-তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছেন। আর কেবল এদেশে নয়-আমেরিকা থেকে ইউরোপের প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বর্তমানে আওয়াজ উঠেছে সংস্কৃতির গণমাধ্যমগুলিকে সুস্থ আনন্দ, সত্য সংবাদ এবং শিক্ষার বাহন করা হোক। যন্ত্র ভিত্তিক সংস্কৃতির মাধ্যমগুলি পাবলিক সার্ভিস বলে গন্য করা হোক।

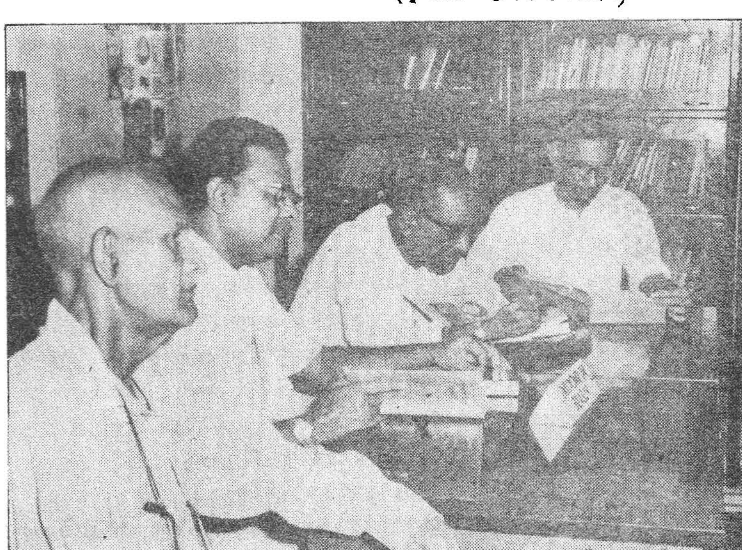
এই সব কারণে বামফ্রন্টও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবিতে যন্ত্রভিত্তিক সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রতি রাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা চাইছে। কলকাতা শহরে সভা-সমিতি ছাড়াও সিনেমা, নাটক, যাত্রা প্রভৃতির সুস্থ বিকাশে সাহায্য করার পরিকল্পনা নিয়েও কাজ করছে। কিন্তু এদেশে এগুলির ক্ষেত্র এখনও সীমাবদ্ধ। এবং সেই কারণে দূর দূরান্তে গ্রামের মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা তাদের নিজেদের চেষ্টায় মেটাতে হয়।

প্রথমে বলে রাখা দরকার, বামফ্রন্ট সরকার যাদের নিয়ে রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ গঠন করেছে তাদের অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজগুলির অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতির গবেষক এবং গ্রামাঞ্চলে লোকসংস্কৃতি বিদ্‌দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখেন। সরকার গঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁরা নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া প্রায় ৭০ জন খ্যাতনামা গবেষকদের কাছে প্রশ্ন পাঠিয়ে তাঁরা যে সুপারিশগুলি পেয়েছেন তার অধিকাংশ গ্রহণ করে কর্মপদ্ধতি স্থির করেছেন। এঁদের মধ্যে বিদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত অধ্যাপক যেমন আছেন, তেমনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকসংস্কৃতির উপর গবেষনা চালান এমন লোকও আছেন। কাজেই নির্বাচনী কৌশল ও ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন এঁদের ধারণাতে নেই। এঁরা সকলেই আমাদের দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিবর্তন, তাদের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি এবং তার থেকে উদ্‌ভূত সংস্কৃতি বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত থেকে তাদের সৌন্দর্য ও শিক্ষামূলক সংস্কৃতিগুলি সন্ধান করেছেন এবং আধুনিক জীবনের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেইগুলি উন্নতি বৃদ্ধির কথা চিন্তা করছেন।

এই কাজগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে করার জন্য কয়েকবছর ধরে আঞ্চলিক এবং জেলাস্তরে কর্মশিবির করা হয়েছে এবং লোকশিল্প ও শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিবর্তন সম্পর্কেও অনুসন্ধান চলছে। সরকার বা পর্ষদের তরফ থেকে শিল্পকলা ও শিল্পীদের সৃষ্টির উপর কোনকিছু চাপাবার চেষ্টা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার যখন বর্গা চাষীর জমির উপর জমির সম্পর্ক সুনিশ্চিত করে তখন যেমন অধিক ফসল উৎপাদনের আশা করে তেমনি লোকসংস্কৃতির সম্পর্কে প্রাথমিক যে কাজগুলি করা হয়েছে তার দ্বারা গ্রামের গণতান্ত্রিক মানুষ যাতে নিজ নিজ অঞ্চলে সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে তার উন্নতি বৃদ্ধির চেষ্টা করে-এই আশা বামফ্রন্ট সরকার করছে। এই কারণে একটা সেমিনার করে পঞ্চায়েতের সাহায্যে লোকসংস্কৃতির উন্নতি বৃদ্ধি করা যায় কিনা এই প্রস্তাবও সরকার পঞ্চায়েতগুলির সামনে রেখেছে। কারণ বাইরে যে কোন গবেষক বা সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা জানবেন-তাঁদের গ্রামে কোন সংস্কৃতি জীবন্ত, প্রভাবশালী এবং সুস্থ।

আমাদের শহরগুলি মতই গ্রাম কিন্তু একরকমের নয়-যেমন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আছে তেমনি তার সাংস্কৃতিক প্রকাশেও বৈচিত্র আছে। যেমন ভূগোল তেমন ইতিহাসের সঙ্গে এই সকল মানুষও তার সংস্কৃতির বিকাশ লাভ

(পৃষ্ঠায় ৫৭৭ শেষাংশ)



লোকসংস্কৃতির রাজ্য গ্রন্থাগারের বিধানসভার সদস্য শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীরবীন মুখোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার এবং লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সহ-সভাপতি শ্রীসুধী প্রধান

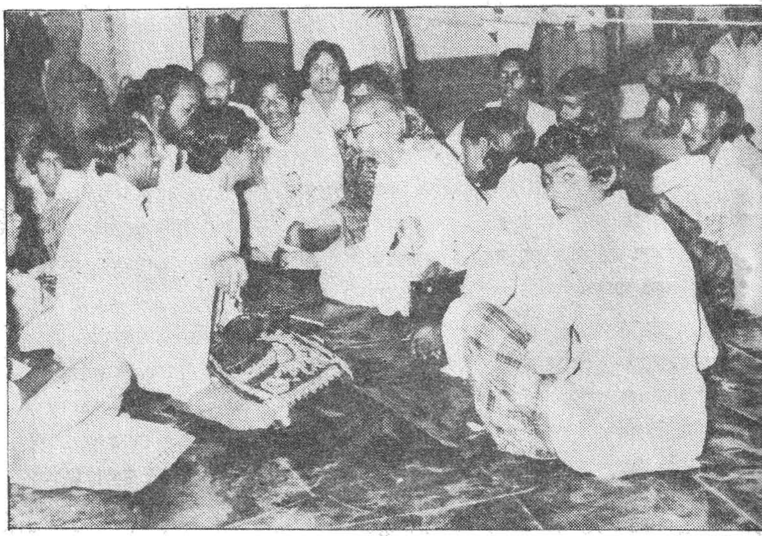
পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পের অতীত ও বর্তমান

শ্রী গোপীনাথ সেন

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পশ্চিমবাংলার লোকশিল্প যে সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ দিচ্ছে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া, বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিপি এবং মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক। শুশুনিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে আদি-প্রস্তরযুগের হাতিয়ার। এর কতকটা অনুকৃতি-মূলক শেষ প্রত্নাশ্মার কালের ছোট ধরনের আয়ুধ, ক্ষুদ্রাশ্মীয় ছুরিকা, চাঁছবার সরঞ্জাম, সূক্ষ্মাগ্র ফলা ইত্যাদি এবং একাধিক নবাশ্মীয় মসৃন কুঠার। শেষ প্রত্নাশ্মার কালের হাতিয়ারগুলির মধ্যে আছে বিবর্তিত ক্ষুদ্রায়তন হাত-কুঠার এবং অবতল (Concave) ধারযুক্ত ও সূক্ষ্মাগ্র বাহুবিশিষ্ট একটি ছেদক অথবা চাঁছবার যন্ত্র। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে পশ্চিমবাংলায় লোকশিল্পকলার উন্মেষ হয়, তার পরিচয় পাওয়া যায়। পাণ্ডুরাজার ঢিপি রাজারডাঙ্গা সুরথ রাজার ঢিপি-মন্দিরা-গঙ্গাডাঙা-মঙ্গলকোট-হাজরাডাঙা-বসন্তপুর-ধানটিকরার ঢিপি-রাণী ঢিপি (খাসপুর)-মহিষাদল-নানুর-কিরনাহার-বেলুতিজোরের ডাঙা (হারাইপুর)-পোতান্দা-কোটাসুর প্রভৃতি স্থানে। প্রত্নতত্ত্বের সমীক্ষায় চাল কোলিথিক সংস্কৃতির বহু সম্ভার এসকল স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল স্থানে একটি "তাম্রভান্ডার", ও নানারকমের লালরঙে রঞ্জিত চীনামাটির পাত্র পাওয়া গেছে। একসময় তাম্রসংস্কৃতি পশ্চিমবাংলায় কতখানি প্রসার লাভ করেছিল তার পরিচয় কংসাবতীর উপত্যকায় তামাজুড়ি থেকে তামার স্কন্ধ দেওয়া কেল্ট (Shouldered Coppers Celt) মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখার উপত্যকা থেকে চাতলা কেল্ট (Chatla Celt) সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৬২ সাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ পান্ডু রাজার ঢিপির খনন কার্য করতে থাকেন, তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৬৫ সালে। সেখানে পাওয়া গেছে মালওয়া পাত্রের মত চীনামাটির পাত্র, কালোরঙের জ্যামিতি চিত্রিত পাত্র, স্বল্পগভীর গোলাকার পাত্র, লালকালো রঙের চীনা মাটির পাত্র (এর ভিতরটি সাদা রঙের), ভেঁড়ু আকৃতি বিশিষ্ট পাত্র (এর তলদেশটিতে ছিদ্র আছে), শিরস্ত্রাণ-আকৃতি ফুলদানী (গভীর পাত্রগুলি পাদানের উপর স্থাপিত, রেকাবগুলি পায়ার উপরে দাঁড় করান), কুঁজোর সঙ্গে ঢাকনি, পাকানো বালা, গোল বালা, তামার বা হাড়ের বল্লম, তীরের মাথা, এবং পাথরের পুঁথি ইত্যাদি।

এই সময়কার জনগণ রেশম ও তুলার বস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাঁদের গৃহের আকার ছিল ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ। এই গৃহে বহির্ভাগটি কাঠ ও বাঁশের তৈরি। দেওয়ালে বাঁশের তৈরি মাটির প্রলেপ দেওয়া। গৃহের ছাদের আচ্ছাদনে পোড়ামাটির টালি আর মেঝে মাটি ও চুন দিয়ে তৈরি। কোথাও তামার পাত্র ও পুঁথি পাওয়া গেছে। রাজার ঢিপির প্রথম আগন্তুকগণ যে লোহার ব্যবহার করতেন তাঁদের নির্মিত অস্ত্র ও নানারকমের দ্রব্য তার সাক্ষী। পান্ডুরাজার ঢিপি থেকে পোড়ামাটি বা টেরাকোটা মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে। এটি চালকোলিথিক যুগের পূর্বে বলে অনুমান করা হয়। ২৪ পরগণা দেউলপোতা থেকে তামায় খোদিত মূর্তির মাদুলি সংগৃহীত হয়েছে। এই সকল থেকে পশ্চিমবাংলার অতীত লোকশিল্পের আভাষ পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবাংলার তাম্রলিপ্ত বা মেদিনীপুরের তমলুক থেকে সংগৃহীত নব-প্রস্তর যুগের অর্থাৎ নিওলিথিক যুগের মূল্যবান জিনিসপত্র পোড়ামাটির বা টেরাকোটার মানুষের মূর্তি বা যন্ত্রপাতি পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় এই সকল শিল্পের নিদর্শন রক্ষিত আছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর হাড়ের পাত্র, পোড়ামাটির বা ট্যারাকোটার তৈরি মানুষের মাথা, যক্ষিনী বৃত্তান্ত-ঘটিত ফলক ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত পূর্ব-ভারতের ভূমধ্যসাগর দ্বীপের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যপোত ছিল। তাম্রলিপ্তের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর নৃতাত্ত্বিক গুরুত্বও কম নয়। এর প্রমাণ প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ বা জান্তব দেহের অস্থিপঞ্জর। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ তাম্রলিপ্তে খননকার্য চালিয়ে এখান থেকে বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির নমুনা উদ্ধার করেন। সেগুলি ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত লোকনাট্যের ওয়ার্কশপের একটি দৃশ্য

খ্রীষ্টের পরবর্তী যুগে পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পে একটি নিজস্ব ভাবধারা চলে আসছে। অতীত যুগ থেকে কাঁথা, পুতুল, আলপনা, পট, মাটির দেবদেবীর মূর্তি, কাগজের শিল্পকলা, কাঁসা ও পিতলের শিল্প, বেত ও বাঁশের শিল্প, মাটির বা চীনামাটির শিল্প, পাথর শিল্প, শাঁখা শিল্প, হাতীর দাঁতের শিল্প, শোলা শিল্প, ডাকের সাজপোষাক, চর্ম শিল্প, ঝিনুক শিল্প, মুখোশ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ও সূচি শিল্প কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার মানুষকে অভিভূত করেনি এর দ্বারা ভারত তথা বিশ্বের লোকশিল্প অনুরাগিগণ বিশেষ অভিভূত হয়েছেন!

কাঁথার অর্থ গাত্র আবরণ। কাঁথা আভরণরূপেও ব্যবহৃত হত। পশ্চিমবাংলায় গ্রাম্য নারীদের কাঁথা শিল্প একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাঁরা পুরানো ছিন্ন বস্ত্র থেকে কাঁথা তৈরি করেন ও তার উপর সূচি শিল্পের চাতুর্যে করে থাকেন অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি। শীতের প্রতীক্ষায় সারা বছর গ্রাম্য নারীরা দুপুরের নিদ্রা ত্যাগ করে একান্ত মনে সূচ সঞ্চালনে সূতার নানারঙে ফুটিয়ে তোলেন কাঁথার শিল্প কলা। কাঁথার শিল্প কার্যে সংগতি লক্ষ্য করা যায়, যার পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধযুগে। এই কাঁথা শিল্পীদের হস্তচালিত সূতির শিল্পকলায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সাধারণত কাঁথা শিল্পের নক্সা ধর্মানুষ্ঠান ও ব্রতের আলপনাকে অনুসরণ করে। যেমন,

মন্ডল, শতদলপদ্ম, কলস, ও শঙ্খ। ডক্টর স্টেলা কেমারিস বলেছেন, "the tree is life, horses stand for the sun, circles the cosmic wheel and order, swastika for movement and all have their definite places in the well balanced design", অর্থাৎ বৃক্ষই জীবন, অশ্বগুলি সূর্যের প্রতীক, চক্রগুলি জাগতিক বিন্যাস, স্বস্তিকা গতির প্রতীক এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে চলেছে। প্রাচীন কাঁথাগুলি দোরোখা এবং নানা চরিত্রে চিত্রিত হত। অর্থাৎ এর সোজা ও উল্টোপিঠে একই চিত্র দেখা যেত কিন্তু পরবর্তী যুগে কাঁথারগুলির একটি পিঠে চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। কাঁথা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যেমন (১) লেপ-এটি ছয় ফুট লম্বা ও চারফুট চওড়া এবং বেশ পুরু হয় (২) সুজনী কাঁথা সাধারণত কোন উৎসবে বিছানায় বিছোবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি বেশ বড় চার চৌকণা পরিমাণে ছয় ফুট লম্বায় ও তিন ফুট চওড়ায়। (৩) বায়তন কাঁথা বই কিংবা দামী জিনিসপত্র ঢাকনির জন্য তৈরি করা হয়। এর পাড়ে মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি। সূচি শিল্পের দক্ষতায় প্রস্ফুটিত। এই ঢাকনির চারকোণে সূচি শিল্পের সাহায্যে নক্সায় কলস পদ্ম এবং গাছপালার নানান দৃশ্য চিত্রিত।

(৪) কাঁথার ওয়াড় বালিশের জন্য তৈরি করা হয়। এর পরিমাপ দু'ফুট লম্বা ও দেড় ফুট চওড়া। এর পাড়ে সূচিকার্যের চিত্রিত হয় সৌন্দর্যমন্ডিত গাছপালা ও পক্ষী।

(৫) আরসিলতা অর্থাৎ আরসির ঢাকনি এর পরিমাপ সাড়ে এগার ইঞ্চি। এর পাড়ে আছে লতাপাতা, পদ্ম ও গাছের বাহার।

(৬) দুরজনি থালিয়া। এটি চারচৌকোণা মধ্যস্থানে পদ্ম। দুরজনি কাঁথা তৈরি খুবই সুন্দর। এর তিনটি কোণা মোড়া। মধ্যস্থল দিয়ে দুরজনির শিল্প সৃষ্টি করা হত এবং ওপরের অংশটি ফাঁকা থাকে যাতে পয়সার থলি ঢোকানো যায়।

(৭) রুমাল কাঁথা এটি ক্ষুদ্র আকারে চারচৌকোণা এবং পদ্ম ও নানা চিত্রে চিত্রিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে কাঁথা শিল্পের খুবই প্রচলন ছিল। প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব শিল্পধারা এই কাঁথায় বিকশিত হত। কাঁথাগুলির নক্সা সূচিশিল্পের আগে আঁকা হয়। তারপর সূচে একসঙ্গে পাঁচ ছয়টি সুতা পরানো হলে প্রথম একটি কোণ থেকে সেলাইয়ের পর শেষে সেই স্থানে শেষ করা হয়ে থাকে। কাঁথা শিল্পিগণ সূতার তিনটে রঙ পছন্দ করে। যেমন নীল, সবুজ ও কালো যা সত্ত্ব রজ তমের প্রতীক বলে মনে করা হয়। কাঁথায় দুই ধরনের রূপ দেওয়া হয় একটি পৌরাণিক যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান থেকে আরেকটি হলো ব্রত কথার আলপনা থেকে অবলম্বন থেকে। কাঁথার কোনো কোনো স্থানে ঢেউখেলান চিত্র শিল্প দেখা যায়। যার সঙ্গে ভারতীয় বারহুত চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কাঁথা শিল্পীরা লৌকিক বহু দৃশ্য কাঁথায় প্রস্ফুটিত করেছেন। কাঁথা শিল্পের নৈপুণ্য ও চাতুর্য আজও প্রাচীন গ্রাম্য নারীদের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয়। কাঁথার কিছু নিদর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

গ্রামীণ নারীদের শিল্পকলায় একটি বিশেষ দিক হলো মাটির পুতুল তৈরি। কোন আদিকাল থেকে তাঁদের চোখে পুতুল গড়ার স্বপ্ন এসেছিল তা কে বলতে পারে। বাংলার শিশুদের সম্পদ এই খেলনা। তারা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে যখন ঘর-সংসার করবে তখন বাস্তব পুতুল নিয়ে তারা খেলা করবে জগৎ সংসারের আঙিনায়। পশ্চিমবাংলার যেকোনে মেলায় দেখা যায় মাটির পুতুলের সমাবেশ। কৃষ্ণনগরের পুতুল ও মূর্তি বিশ্বের দরবারে বিশেষ সমাদর লাভ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষাকতায় কৃষ্ণনগরের পুতুল কেবল জনপ্রিয় হয়নি যেন জীবন্ত বলে মনে হয়। আজও বাঙালী যেকোন উৎসবে মাটির দ্রব্য ব্যবহার করেন। যেমন পূজার ঘট, থালা, সরা, বাটি, খুরি, প্রদীপ ইত্যাদি। বাঙালী মৃন্ময়ী দেবদেবীর মধ্যে চিন্ময়ীর অস্তিত্ব অনুভব করেন সেজন্য তাদের কাছে মাটি হল পবিত্র। বর্তমানে বাঁকুড়ায় পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া পঞ্চ-প্রদীপ ও খেলনা সম্ভ্রান্ত বৈঠকখানায় স্থান পেয়েছে। পশ্চিমবাংলায় বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটি টেরাকোটা শিল্পখচিত মন্দিরগুলি বিদেশীদের বিস্ময় উৎপাদন করে। মেদিনীপুর ও নদিয়ার মৃৎশিল্পীরা যেসকল পুতুল তৈরি করেন তা দেখে মহেন-জো-দারো হরপ্পা যুগের বলে ভ্রম হবে। কলিকাতার কুমারটুলিতে মৃৎশিল্প আজও চলছে নানান নিত্যনব পরিবেশের মধ্যে। প্রধানত এখানে দেবদেবীর মূর্তিগুলি প্রাধান্যলাভ করেছে তাছাড়া দেবদেবীর বাহন পশুপক্ষীও জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের শিল্পবিন্যাসে।

পশ্চিমবাংলায় মৃৎশিল্পে ঘট ও সরা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কথায় আছে ঘটে পটে দেবীর অধিস্থান। প্রতিটি পুজায় ঘট ও কলসী দেখা যায়। অনেক সময় ঘটের উপর একটি শিস অলা ডাব রেখে দেবীর ধ্যানে তাতে গঙ্গাজল ও ফুল বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করা হয়। আশ্বিন বা কার্তিক মাসে মাটির সরায় নানা রঙে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি আঁকা হয়। একে লক্ষ্মী সরা বলা হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় এই সরাগুলি পূজার উপকরণ হিসাবে অপরিহার্য। কুমোররা পূজার আগে সরা তৈরির কাজে লেগে যান। এরকম সরা তৈরি করতে আধ কিলো থেকে এক কিলো মাটি লাগে। এই সরার গায়ে লক্ষ্মী প্রতিমার মূর্তি চিত্রিত করা হয় নানা রঙের প্রলেপে। এছাড়া সরার গাত্রটি রঙের সাহায্যে ভাগ করে সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, দুর্গা, রামসীতা ও লক্ষ্মী আঁকা হয়। এই সরায় লক্ষ্মী এলোচুলে পেঁচার উপর বসে আছেন দেখানো হয়। সরার ভিতর আরও কয়েকটি ধরনের সরা আছে। যেমন দুর্গা সরা, কৃষ্ণ সরা ইত্যাদি। কলিকাতার কালীঘাটের কুমোররা এরকম সরা তৈরি করেন।

বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পর বাংলাদেশের উদ্বাস্তুগণ পশ্চিমবাংলায় এসে চার রকম সরার প্রচলন করেছে এগুলি হল (১) ফরিদপুরি (২) সুরেস্বরী, (৩) আচার্যি বা গণাকি এবং (৪) ঢাকাই।

(১) ফরিদপুরি সরায় দূর্গা বা রাধাকৃষ্ণ আঁকা হয়ে থাকে।

(২) সুরেশ্বরী-ফরিদপুরের একটি গ্রামের নাম সুরেশ্বরী। তাই এই সরাটির নামকরণ করা হয়েছে সুরেশ্বরী। এই সরায় লম্বা লম্বি চৌখুপী দাঁড়ি বা রেখা টেনে সবুজ, হলদে, কালো এবং ঘেরে লাল রঙে এই চারটি ভাগ করা হয়। তাতে একেকটিতে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি আঁকা হয়।

(৩) আচার্যি বা গণকি ধরণের সরার পশ্চাদটি লাল রঙে রঞ্জিত করে কালো রঙ দিয়ে দুর্গা প্রতিমা আঁকা হয় তারপর এটি খড়িমাটি ঘসে উজ্জ্বল করা হয়।



প্রজাতন্ত্র দিবসে নতুন দিল্লীতে সারা ভারত লোক নৃত্যের সমারোহে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রনপা লোক-নৃত্য শিল্পিবৃন্দ

(৪) ঢাকাই সরাটি কচ্ছপের পিঠের মতন করে তৈরি করা হয়। এর উপর দুটি রেখায় ভাগ করা হয় রঙের সাহায্যে। উপরে আঁকা হয় লক্ষ্মী নারায়ণ এবং নিচে পেঁচার বদলে ময়ূরপঙ্খী নৌকা। অনেকের ধারণা বাংলার প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য ঢাকার বুড়ি গঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

সরা আজও পালপার্বণে শ্রাদ্ধে বিশেষ ব্যবহৃত হয়। মৃৎশিল্পের পূর্ববঙ্গের ঘট যেমন মনসার ঘট, সরা ও অন্যান্য মৃৎশিল্পের বিশেষ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ শিল্পীদের উপর বিস্তার করেছে। পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পে মাটির তৈরি ছাঁচ বা ব্লকগুলি বহুযুগ থেকে চলে আসছে। মৃৎশিল্পীরা ছাঁচগুলির নক্সা নরুণ দিয়ে খোদাই করেন। নানা সন্দেশর ছাঁচ যেমন গোলাপফুল শাঁখ পাখি ইত্যাদি। মৃৎশিল্পে বিবাহ বা শুভ কাজে এর প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে বিবাহের বরণডালায় বহু সামগ্রী দেখা যায়। যেমন হাতল দেওয়া চারটি বাটি ঘট ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পে কাঁসা ও পিতলের স্থান সর্বোচ্চে। খাগড়া কাঁসার বাসন এখনও বাঙালীদের ঘরে ঘরে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এছাড়া বাঁকুড়া নদিয়া ও মেদিনীপুরে নানা কারুকার্য খচিত কাঁসার বাসন ও পিতলের মূর্তি পশ্চিমবাংলার জনপদে পবিত্রতা ও প্রসন্নতা বহন করে আসছে।

পশ্চিমবাংলার ধাতু শিল্পের মধ্যে ধোকরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দেশে ও বিদেশে এর চাহিদা আছে তার আদিম অকৃত্রিম ও অভিনব শিল্প কলার জন্য। এক সময়ে ভবঘুরে উপজাতিগণ এই শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমানে সরকারি প্রচেষ্টায় তাঁরা বাঁকুড়া ও বর্ধমান, মালদহ, মেদিনীপুর জেলাগুলিতে বসবাস করে নিজেদের শিল্প সৃষ্টি করছেন। তাঁদের শিল্পগুলি খুবই সাদামাটা। তাই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাটির ছাঁচের উপর তেল ও রজন দিয়ে তারপর ধাতু গলিয়ে নানারকমের শিল্প সৃষ্টি করেন। তাঁদের তৈরি লক্ষ্মীপেঁচা, ধূপদানী, আরতি ও প্রদীপ পিলসুজ ও খেলনা খুবই চিত্তাকর্ষক। পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলা গ্রামের পিতলের রথ গ্রাম্য জীবনের শিল্পে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এই প্রতিলিপি শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে ছাত্রাবাসের দেওয়ালে অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালীঘাটের হাত-পা-বিহীন কাঠের লাল হলুদ বর্ণের পুতুল খোকা খুকুদের খুবই প্রিয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একাঠের পুতুলের নির্মাতা ছুতার মিস্ত্রি। পুতুলের মুখ ও নাক ছাড়া দেহটিতে হাত পা নেই। কেবলমাত্র বুকের কাছটি উঁচু ধরনের। এটি ছয় থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা হয়। যখন দোলনায় শিশু কাঁদে তখন তার কান্না থামাবার জন্য কাঠের পুতুল টি শিশুর হাতে দিয়ে মা বলেন-

কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
কার সঙ্গে গোঁসা করে ভাত খাওনি কাল
মারিনিকো ধরি নাইকো বলি নাই কো দূর
সবেমাত্র বলেচি গোপাল চড়াগে বাছুর

পুতুলটি পেয়ে ক্রন্দমান শিশুর ক্রন্দন থেমে যায়। এটি যেন যাদুমন্ত্রে কাজ করে। শিশু কান্না থামিয়ে হাত পা ছুঁড়ে আবার খেলা করে। শিল্পী হাতে তৈরি হয় কত রকম কাঠের পুতুল, পশুপক্ষী আধুনিক যন্ত্রচালিত খেলনা।

কাষ্ঠ শিল্পের বৃষকাঠ ও মকর কাঠ এই দুটি কাঠের শিল্পকলা প্রাচীন কারুশিল্পীদের ধ্যানধারণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃষকাঠটি সূক্ষ্ম শিল্প কলায় মন্ডিত। ইহা শ্রাদ্ধের সময় একপাশে প্রেতের প্রতীক রূপে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এখনও গ্রামে পুকুরের ধারে বৃষকাঠটি দাঁড় করিরয়ে শ্রাদ্ধ করার রীতি দেখা যায়। মকর কাঠটির দুধারে মকর বা শীলমাছের মূর্তি খোদিত করা হয়। এই কাঠটি দুটি দিকে আংটার মত দুটি গর্ত রাখা হয়, তাতে দোল পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন ঝুলানো হয়ে থাকে।

কাঠের খোদিত লোকায়ত শিল্প বর্তমানে কলকাতা, দার্জিলিং, বর্ধমান, ও হুগলীর বহুস্থানে শিল্পীদের প্রচেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে। এর চাহিদা ক্রমশ দিন দিন বাড়ছে, তার পরিসংখ্যা ভারত সরকার কর্তৃক রপ্তানির সমীক্ষায় দেখা যায়।

পশ্চিমবাংলার এক সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল কাগজের পুতুল নাচ। লোক আনন্দ বিনোদের অঙ্গ হিসাবে পুতুল নাচ প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে। সংস্কৃত নাটকের ইতিবৃত্ত হিসাবে পুতুল নাচের তাৎপর্য সর্বাধিক। অনেকের ধারণা সংস্কৃত নাটকের প্রধান নির্বহককে বলা হত সূত্রধার যার চলতি অর্থ হল যিনি সমস্ত নাট্য অনুষ্ঠানটির সুতো ধরে থাকেন। তেমনি পুতুল নাচের প্রধান নির্বহকের হাতে সূতো থাকে যাতে তিনি সমগ্র পুতুল নটনটীদের পরিচালনা করেন। পশ্চিমবাংলার নিম্নজেলাগুলিতে লোক চিত্তবিনোদের জন্য পুতুল নাচের প্রচলন দেখা যায়। কোন উৎসবে পুতুল নাচ ও পুতুল নাট্য দেখান হয়। এই পুতুল নাচ ও নাট্য পরিবেশন করেন পেশাদারী দল। মানুষের একমাথা সমান মঞ্চ তৈরি করা হয় এবং তার সামনে পর্দা ঝুলান থাকে। এই মঞ্চের পিছনে থাকে বাদকেরা। পর্দা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পুতুলদের অভিনয়ের পালা। দর্শকেরা পুতুলদের কেবল মাথাগুলি দেখতে পান। পুতুলরা মৌন কিন্তু তাদের কথা ও গান সূত্রধার নিষ্পন্ন করে থাকেন, পুরুষও নারীর গলা নকল করে। চব্বিশ পরগনায় মাহিষ্য শিল্পীদের পুতুল নাচের জন্য খুবই নামডাক ছিল। পশ্চিমবাংলায় পুতুল নাচের অন্যান্য পালার মধ্যে চাঁদসওদাগর বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলাগুলিতে বিশেষ করে উত্তর বিহারে সকল শ্রেণীর লোক শ্রাবণ মাসে 'মনসার পালা' নামে পুতুলনাচের নাটক সারারাত ধরে দেখেন এবং উত্তর বাংলায় 'মনসার জট' নামে পুতুলনাচের অনুষ্ঠান অনগণকে মোহিত করে। শিল্পীরা পুতুলগুলি কাগজ ও কাপড় দিয়ে তৈরি করেন এবং সুতোর টানে তাদের প্রাণসঞ্চালন করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলার মানষ পরিচিত হত রূপকথা, রসকথা ও লোককথার সঙ্গে। ক্রমশঃ কাগজের পুতুলগুলি বাংলার জনপদ থেকে অদৃশ্য হতে চলেছে, সেখানে স্থান নিয়েছে রাজস্থানের কাঠের পুতুল নাচ। পুরুলিয়া ছৌনৃত্যে কাগজের মুখোশ দর্শকদের মনে ভয়ভক্তি সঞ্চার করে। কাগজের দেবদেবীর মুখোশ আর রাক্ষস ও জীবজন্তুর মুখোশগুলি খুবই চমকপ্রদ।

পশ্চিমবাংলায় লোকশিল্পে পট বিশেষ করে কালীঘাটের পট, যদুপট, বিষ্ণুপুরের তাস এবং বীরভূম, মেদিনীপুর ও হুগলীর কুড়িহাত লম্বা গুটান পট যেন দর্শকদের চালচিত্রের মত মুগ্ধ করত। এই পটে দেখা যেত মনসাগীতিচিত্র। কর্ণার্জ্জনের গাথা, রামায়ণের কাহিনী, ব্রাঘ্রদেবতা ফতেগাজি ইত্যাদি।

প্রাচীন কালে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি ঘরে শিকে বা শিকা দেখা যেত যা তৈরি হত পাটের আঁশা থেকে। পাটের আঁশের দড়ি তৈরি করে শিকা তৈরি হয় যা ঝুলত ঘরের কড়িকাট থেকে। শিল্পীরা পাটের তৈরি ঝাড়লন্ঠন, পাখীর বাসা এবং নানারকমের থলে তৈরি করতেন যার মধ্যে তাঁদের শিল্পরসের পরিচয় পাওয়া যেত।

পশ্চিমবাংলার নারীদের শিল্পীমনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের ব্রতের আলপনার নিদর্শন থেকে। চালের গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে তরল করে সেটি নিয়ে আঁকা হয় আলপনতা। তাঁরা এই আলপনা অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে লোকশিল্পকলার নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। এই শিল্পকে অবলম্বন করে সূচীশিল্পী, দারুশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পীগণ নিজ নিজ শিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছেন। আলপনায় চারু ও লোকশিল্প কলার সমন্বয় দেখা যায়, যেমন মাঘমন্ডল ব্রতের ছড়ায় কথা ও চিত্র উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে। যেমন-

"মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই রাজা
মা পটেশ্বরী

আপনে বিম্বধরী।"

ব্রতের কথা বর্ণাঢ্য চিত্রের অঙ্কনে রূপ পেয়েছে। লক্ষ্মী পূজায় এখনও গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে আলপনা ভরিয়ে তুলে। আপনার মধ্য দিয়ে জাগতিক, ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক সকল বস্তুকে চোখের সামনে তুলে ধরেন।

পশ্চিমবাংলায় হাতীর দাঁতের শিল্প ভারত তথা জগতের শিল্পনুরাগীদের মন হরণ করেছে। বহরমপুর, খাগড়া মুর্শিদাবাদ এবং দার্জিলিং-এর শিল্পীদের হাতীর দাঁতের সূক্ষ্মশিল্প দেখে মোহিত হতে হয়। খাগড়া মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের তৈরী 'ময়ূরপঙ্খী নৌকা' সত্যই দর্শনীয়, এছাড়া গরুরগাড়ী, হাতী, দেবদেবীর মূর্তি, তাজমহল, পাউডার দানী, চিরুনী, মাথার কাঁটা ইত্যাদি। প্রতিটি হাতীর দাঁতের শিল্পতে তাঁদের শিল্পের সৌকুমার্যের পরিচয় দেয়।

পশ্চিমবাংলায় মোষের শিং-এর শিল্প খুবই চমৎকার যেমন সাপ ও নেউল, পাখী, টেবিল ল্যাম্প, চিরুণী, কৌটা ইত্যাদি। এই শিল্প চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুর কেন্দ্রীভূত।

পশ্চিমবাংলায় শঙ্খশিল্পের ব্যাপকতা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। বাঙালী হিন্দুদের কাছে শঙ্খ খুবই। পবিত্র শাঁখ পূজাও বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ এবং হিন্দু বাঙালীদের কাছে শাঁখা এয়োর চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় লোক কথা শাঁখা নিয়ে লোককথা রচিত হয়েছে, এমনকি লোকধর্মীয় নাটকেও অভিনীত হয়ে থাকে। বর্তমানে কলকাতার বাগবাজার ও অন্যান্য স্থানে, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও হুগলি জেলায় শাঁখারীদের ব্যবসার আতিশয্য চোখে পড়ে।

পশ্চিমবাংলার পাথর শিল্প একসময়ে খুবই প্রসার লাভ করেছিল তা এখন অন্তর্হিত প্রায়। এর প্রধান কারণ হল জয়পুর ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পাথর শিল্প কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করেছে। তবু এখনও বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের শিল্পীরা নিজেদের জাত ব্যবসায়কে টিকিয়ে রেখেছেন নানা প্রতিকূলের মধ্যে। তাঁরা মূর্তি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন।

এস সময় শান্তিনিকেতনের কারুকার্য খচিত চর্মশিল্প কেবলমাত্র তাদের নয়নভিরাম হয়েছিল তা নয় এই শিল্প পশ্চিমবরংলায় বিশেষ করে কলকাতায় রপ্তানি ব্যবসায়ে এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছিল। এই শিল্পে হাজার হাজার লোকের যেমন রোজগার হয়েছে তেমনি ব্যবসায়ীরা বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর অর্থাগমে লাভবান হয়েছেন।

চর্মশিল্পের প্রধান উপকরণ ভেড়া ও ছাগলের চামড়া। ব্লক ও ডাইসে শিল্পসৃষ্টি করতে হাতের তুলিকায় নানা রং-এ ভরিয়ে তোলেন নানান চিত্র। এই শিল্পের মধ্যে মাণিব্যাগ, ওয়ালেট, ডায়েরী কভার, লেডিস্ ব্যাগ, মারকেটিং ব্যাগ ইত্যাদি।

পশ্চিমবাংলার মাদুর শিল্প কয়েকটি লোকশিল্পের মধ্যে নিজস্থান অধিকার করে আছে। এই শিল্পে প্রায় অর্ধলক্ষ লোক ব্যাপৃত আছেন। পশ্চিমবাংলার মাদুর শিল্প কেন্দ্র যেমন মেদিনীপুর হুগলী এবং বীরভূম। এই সকল শিল্পীরা চাহিদা অনুযায়ী বাজার প্রচলিত মাদুর থেকে উচ্চস্তরের মাদুর মনলন্দ তৈরি করে থাকেন। এছাড়া তাঁরা দেওয়ালের টাঙগাবার মাদুরের উপর চিত্র ও কারুকার্য, টেবিল মায় ও ডিনার ম্যাট তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করছেন।

পশ্চিমবাংলার অন্যান্য লোকশিল্পের মধ্যে সমুদ্রের ঝিনুক, নারিকেল এবং নারিকেলের ছোপরার শিল্পগুলি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সিল্কের কাপড়ের উপর আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য, শিবপার্বতী, শিবের তান্ডব নৃত্য এবং বহু প্রাচীন কলার দৃশ্যাবলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। পশ্চিমবাংলার তাঁতের শাড়ী যেমন ধনিয়াখালি, শান্তিপুর, ফরাসডাঙগা ইত্যাদি এবং মুর্শিদাবাদের আসল সিল্কের ছাপা শাড়ী, বালুচর শাড়ী এবং বিষ্ণুপুরের জামদানির সঙ্গে ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনা করা যায় না, এমনকি শান্তিনিকেতনের বাটিকের কাজগুলি এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপূর্ব।

পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পে বেত ও বাঁশ শিল্প ব্যাপক না হলেও কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করে আছে। কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমান, হুগলী, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এই শিল্পকার্যে বহুশিল্পী কাজ করছেন। তাঁরা হস্তশিল্পে বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে ঝুড়ি, চুবড়ি, ফুলদানি, ফুলেরসাজি ইত্যাদি তৈরি করেন এবং বেতের মোড়া, ব্যাগ এবং বহু দ্রব্য তৈরি করছেন।

শোলাশিল্প পশ্চিমবাংলায় অনন্য সাধারণ। ভারতের অন্য কোথাও শোলাশিল্প দেখা যায় না। শোলার তৈরি ডাকের সাজ মৃৎপ্রতিমাগুলিকে উজ্জ্বল কোরে তুলে। দেবদেবীর মাথার মুকুট, গহনা এবং চালচিত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্যাবলী খুবই সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমায় শোলার ফুল, টিয়া, কাকাতুয়া এবং খেলনাগুলির কাজ ও শিল্পকলা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। শোলাশিল্প ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমনা, হুগলী ও বাঁকুড়ায় দেখা যায়।

বর্তমানে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় মৃতপ্রায় লোকশিল্পের পুররুজ্জীবন সম্ভভ হয়েছে। এই শিল্প প্রদর্শনীর জন্য তাঁরা বিপণি, মেলা ও প্রচার করছেন। এমনকি লোকশিল্পীদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করে থাকেন। পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পকে সতেজ ও সঞ্জীবিত করতে হলে চাই পশ্চিমবাংলার জনগণের অন্তরের সহানুভূতি।

উদ্যোগ বৃদ্ধি প্রয়োজন

(৫৭৩ পৃষ্ঠার পর)

করেছে। তাই গ্রামে গণতান্ত্রিক বিকাশকে অগ্রসর না করে উপর থেকে কিছু চাপাতে গেলে তা শ্রুতিকটু এবং দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে বলেছিলেন-গ্রামের সংস্কৃতির কিছু সীমানা আছে-যেমন গম্ভীরা-আলকাপ বা ছৌ। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা পেলে যে এরা সীমানা অতিক্রম করতে পারে-তাতো বাউল বা ছৌ প্রমাণ করেছে। বাউল প্রধানত একক সঙ্গীত। কিন্তু যেগুলিতে অনেক লোক লাগে-তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তার অঞ্চল এবং শহরের গণতান্ত্রিক জনসাধারণ ও সংস্কৃতিবিদ। তাই তার পৃষ্টপোষকতায় সমাজকে অগ্রসর হতে হয়।

গ্রামের যে সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে যার পিছনে সরকারি অর্থ ও লোক নিযুক্ত-তাদের বুঝতে হবে যে তাদের অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি স্কুল, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মত একটা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে-যার মারফতে গ্রামের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সুস্থ রসবোধ, প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং নৈতিক শিক্ষা বাহনের কাজ করছে। বামফ্রন্ট সরকার একটা কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে-রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, রাজ্য সংগ্রহশালা, লাইব্রেরি, পাক্ষিক পত্রিকা এবং প্রতি জেলাতে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে, কমিটি লোকশিল্পীদের মধ্যে যারা দুঃস্থ তাদের সাহায্যের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে-কিন্তু এগুলি যথেষ্ট নয়। গ্রামের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক মানুষ, শিক্ষক, ছাত্র ও যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে, সরকারি উদ্যোগকে জনগণের উদ্যোগে পরিণত করতে হবে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কাজকে 'হারামণি' সংগ্রহ বলে গণ্য করেছিলেন এবং ওপার বাংলার জীবিত সেই ঐতিহ্যের মানুষ 'হারামণি'-র রচয়িতা মহম্মদ মনসুরউদ্দিন যে কাজকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিবান মানুষ সেই কাজের গভীর তাৎপর্য বুঝে অগ্রসর হবেন-এই আশা আমরা করতে পারি।

বাংলার লোকনাট্যের আলোচনাচক্র ঃ প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা

শ্রীমানস মজুমদার

নাট্য সাহিত্য আর নাট্যাভিনয় নিয়ে আলোচনায় আমাদের উৎসাহ নেই, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। নাটক অনেক লেখা হচ্ছে, ছাপা হচ্ছে, হচ্ছে নাটকের অভিনয়ও। হচ্ছে অনুবাদ, অনুবাদের পুনর্মুদ্রণ, ক্ষেত্র বিশেষে অনুদিত নাটকে প্রযোজনা। মঞ্চ, নাট্যতত্ত্ব, নাটকের ইতিহাস এসব নিয়েও লেখালেখি চলছে। বিশেষ বিশেষ নাট্যকারের উপর এক বা একাধিক বইও প্রকাশিত হচ্ছে। ভিন দেশের নাটক, নাট্যকার, নাট্যাভিনয় নিয়েও আমাদের কৌতূহল প্রশংসাযোগ্য। দীর্ঘকাল স্থায়ী ও স্বল্পকাল স্থায়ী বহু নাট্য সংস্থা, ছোট বড় নাট্য-পত্রিকা শহর ও শহরতলির-নাট্য-প্রতিযোগিতা এবং নাট্য-সম্পর্কিত আলোচনাচক্র আমাদের নাট্যোৎসাহের পরিচয়ই বহন করে।

কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় লোকনাট্যের প্রসঙ্গ কতখানি উচ্চারিত হয়? সামান্যই। কারণও আছে বই কি! লোকনাট্যের অনুষ্ঠান যখন তখন যত্রতত্র হয় না। বাংলার অঞ্চলবিশেষে লোকনাট্যের বিশেষ বিশেষ যে অভিনয় হয় তার খোঁজ সব সময় সকলের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। বাৎসরিক কোন উৎসব উপলক্ষে কোন কোন লোকনাট্যের-অভিনয়-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে একথা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ নাট্যোৎসাহীর পক্ষে সে অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়ে ওঠে না। আসলে আমাদের নাট্য চর্চা তো প্রধানত কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার খবরাখবর আমদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। কিন্তু বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকনাট্যের অভিনয়-অনুষ্ঠানে খবর অত সহজে পৌঁছোয় না। রাজধানী কলকাতায় নাটক নিয়ে চলছে নিত্যি নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সে পরীক্ষ নিরীক্ষা রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের নাট্যগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারও করছে। আবার নাটক নিয়ে যে ব্যবসা বাণিজ্য তারও মহাপীঠস্থান এই কলকাতা। কলকাতাকে একার্থে নাট্যতীর্থ বলা চলে। হয়ত নট নটী তীর্থ। রাজধানী কলকাতায় বা রাজ্যের অন্যান্য বড় শহরে কালে ভদ্রে লোকনাট্যের অনুষ্ঠান হয় ঠিকই, কিন্তু ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়।

লোকনাট্যের মুদ্রিত নিদর্শনও খুব বেশি নেই। কোনো কোনো লোকসংস্কৃতি গবেষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পরিমাণটা সামান্য। আর কোন মফঃস্বল পত্রিকায় বা গবেষণা গ্রন্থে তা আছে সে খবরও অধিকাংশেরও অজানা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত লোকনাট্য পালা রয়েছে সেগুলির কোন সংকলন এখনও আমরা করে উঠতে পারিনি। অসংখ্য লোকনাট্য বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। এ শুধু অক্ষমতা নয়, লজ্জাও। আমাদের হাজার ঔদাসীন্যের আরেক উদাহরণ। সে যাই হোক লোকনাট্যের মুদ্রিত নিদর্শন হাতের কাছে থাকলে এর স্বরূপ খানিকটা বোঝা যেত, কিন্তু সে সুযোগও বিশেষ নেই।

লোকনাট্য নাটক, কিন্তু মঞ্চাশ্রয়ী তথাকথিত নাটকের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। লোকনাট্য লোক ঐতিহ্যাশ্রয়ী রচনা। লোকসমাজ এর স্রষ্টা। এ সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তিস্রষ্টা যদি থাকেও তো সে উপলক্ষ্য মাত্র। অর্থাৎ সে সমগ্র লোকসমাজেরই প্রতিনিধি। ব্যক্তির সৃষ্টিকে ইচ্ছেমতো বদলে নেয় লোক সমাজ। যতক্ষণ না তার মনমত, অর্থাৎ রুচি ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার ও নীতিবোধের অনুকূল হয়, ততক্ষণ চলে এই ভাঙা গড়ার পালা। লোকনাট্যের অভিনেতা ও দর্শকগণও ঐ একই সমাজের সদস্য।

লোকনাট্যের বিষয়বস্তু লোকজীবন ও লোকঐতিহ্যনির্ভর। প্লটে প্রায়শই ঠাসবুনোনের অভাব আছে। পাত্রপাত্রী দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভূত সংলাপে লোকমুখে ব্যবহৃতবুলির প্রতিধ্বনি। গদ্য-পদ্য দুজাতীয় সংলাপই শোনা যায়। সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য।

উপস্থাপনা পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আছে। কখনও নৃত্যমুখ্য। যেমন, নদিয়া-২৪ পরগনার "পুতুল নাচ" বা পুরুলিয়ার ছৌ,। কখনও সঙ্গীত মূল্য। যেমন, প্রান্ত উত্তরবঙ্গে রঙ পাঁচালি "গুলাপীশ্বরীর পালা" বা খাঁস পাঁচালী 'কানডাঙা-ঢেংপাড়ীর পালায়'। গদ্য সংলাপ মুখ্য বর্ধমান একটি "নেটো" (লেটো) পালা। এর উদাহরণ পাই সুকুমার সেনের "নট নাট্য নাটক" গ্রন্থে। অধিকাংশ লোকনাট্যেই কিন্তু একাধিক রীতিমিশ্রণ ঘটেছে। কোন কোন পুতুল নাচের পালায় নৃত্যগীত ও সংলাপে ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। অনুরূপ রীতি-মিশ্রণ দেখা যায়। মালদহের "গম্ভীরা গানের", ডোমনি গানের "পশ্চিম দিনাজপুরে খন গানে", প্রান্ত উত্তরবঙ্গের "কুশান" ও "দোতরা" গানে, মালদহ-মুর্শিদাবাদে আলকাপে। এমন উদাহরণ আরও দেখা যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুখোস ব্যবহৃত হয়। যেমন, পুরুলিয়া "ছৌ" বা প্রান্ত উত্তরবঙ্গে "মুখাখেলা-য়"। অভিনয় কালে ঢোল বাঁশি কাঁশি ইত্যাদি লোকবাদ্যের সাহায্য নেওয়া হয়। হারমনিয়াম লোকবাদ্য নয়, কিন্তু কখনও কখনও এযন্ত্রটি ব্যবহারও চোখে পড়ছে। অভিনয় পোশাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর নেই, নিতান্ত সাদামাঠা পোশাক। প্রসাধন উপকরণ চকখড়ি মেটে সিঁদুর আলতা, ভূষোকালি ইত্যাদি। লোকজীবনের এগুলি সহজলভ্য।

লোকনাট্যের অভিনয় আসরে উপস্থিত হলে দেখতে পাই অভিনয় মঞ্চ বলে কিছু নেই। চারদিক খোলা আসরে দর্শকদের মাঝখানে অভিনয় চলে।

১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে রাজ্যসরকারের অনুদান প্রাপ্ত দুঃস্থ লোকশিল্পীদের এবং লোকসংস্কৃতির সংস্থার জেলা ভিত্তিক হিসাব

জেলা	দুঃস্থ লোক শিল্পী	আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল
নদিয়া	৬	২
বর্ধমান	৪	১
বীরভূম	১০	৩
২৪ পরগনা	১৬	৫
মুর্শিদাবাদ	১০	৩
হাওড়া	৯	৫
মেদিনীপুর উত্তর	১০	৫
মেদিনীপুর দক্ষিণ	১৫	৩
কোচবিহার	১২	১
জলপাইগুড়ি	৪০	৫
পুরুলিয়া	৩০	৭
দার্জিলিং	১০	৬
পশ্চিম দিনাজপুর	১৯	৩
বাঁকুড়া	১০	৪
মালদহ	১১	৩
	মোট—২১২	মোট—৫৬

অভিনেতা আর দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে ব্যবধান নেই। অভিনয় ব্যাপারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেহেতু উন্মুক্ত আসরে চারদিকের হাজার হাজার দর্শকের সামনে অভিনয় চলে, সেহেতু অভিনেতার কণ্ঠস্বর হয় তীব্র, আবেগদীপ্ত। অঙ্গভঙ্গিতে আতিশয্য থাকে। আর স্ত্রীচরিত্রে সাধারণতঃ পুরুষেরাই অভিনয় করে। ইদানিং অবশ্য কোনো কোনো স্থলে এর রীতি বদল ঘটেছে। চারদিকের দর্শকদের কথা ভেবে চারদিকে ঘুরে ঘুরে অভিনয় চলে।

নিছক লোকমনোরঞ্জন লোকনাট্যের উদ্দেশ্য নয়, লোকসমাজকে শিক্ষা দান লোকনাট্যের এক প্রধান উদ্দেশ্য। নানা ধরনের অন্যায় অবিচার, শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদও লোকনাট্যে ধ্বনিত হয়।

লোকনাট্যের ধারাটি একদিনে গড়ে ওঠে নি। এর উৎস সুদূর অতীতে নিহিত। যাদু অনুষ্ঠান, উৎসব অনুষ্ঠান, ক্রীড়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি হল লোকনাট্যের উৎস। কালে কালে লোকনাট্যের বাইরের রূপটি স্বাভাবিক ভাবে অল্প স্বল্প পাল্টেছে। কিন্তু আন্তরস্বরূপে বিশেষ বদল ঘটে নি। একালেও সিনেমা, থিয়েটার এবং কলকাতার বিভিন্ন যাত্রা সংস্থা যাত্রাভিনয়ের কিছু কিছু প্রভাব লোকনাট্যাভিনয়ে করছে। অন্যদিকে মনে রাখতে হবে, তথাকথিত উচ্চতর অভিজাত নাট্য প্রয়াসে ভিত্তিভূমি কিন্তু লোকনাট্যাভিনয়ে। দেওয়া নেওয়ার পালা লোকসংস্কৃতি জগতে পুরনো ব্যাপার।

লোকনাট্য লোকসমাজের দর্পণ। লোকসংস্কৃতিবিদের কাছে এক একটি লোকনাট্য রত্নখনি বিশেষ। লোকসমাজকে যথাযথ রূপে চিনতে হলে লোকনাট্যের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। সমাজতাত্ত্বিক লোকনাট্যের সহায়তায় লোকসমাজ সম্পর্কে তাঁর বহু কৌতূহল মেটাতে পারেন। মনস্তাত্ত্বিক লোকমনের হরেক রহস্যের সন্ধান পাবেন। আর ভাষাতাত্ত্বিক লোকভাষা বহু বিচিত্র গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাবেন।



উপজাতি ও লোকসংস্কৃতি-চর্চা-কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার। ছবিতে অন্যান্যদের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার অম্বরীশ মুখার্জি ও পুরুলিয়া সভাধিপতি শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে



পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প

লোকনাট্যের আলোচনা স্বভাবতই তাই মনযোগের দাবি রাখে। কিন্তু আলোচনায় তেমন কোন প্রয়াস তো চোখে পড়ে না। সুখের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এব্যাপারে সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছেন। রাজ্যসরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আনুকূল্যে এবং রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সহযোগিতায় ৪ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি '৮৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় লোকনাট্য নিয়ে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা হচ্ছে। "বাংলার লোকনাট্যের স্বরূপ বিচার; উৎস এবং ক্রমবিকাশের সন্ধান", "বাংলা লোকনাট্যের আঙ্গিক, অভিনয় রীতি এবং মঞ্চ বৈশিষ্ট্য", "বাংলার লোকনাটের আঞ্চলিক প্রভাব", "বাংলার লোকনাট্য; গণশিক্ষা মাধ্যম", "বাংলা লোকনাট্যের শিল্পী সমাজ", "বাংলার লোকনাট্য ও গণনাট্য", "উপজাতি সংস্কৃতি ও উপজাতিদের নাটক", "বাংলার লোকনাট্যের ঐতিহ্য ও বর্তমান কাল", প্রভৃতি বিষয় যেমন আলোচনা থাকছে, তেমনি "পুতুল নাচ", "ধামগান", "বিষহরি", "কুশান", "খন গান", "গম্ভীরা গান", "ডোমনী গান", "আলকাপ", "বোলান গান", "পাঁচালী", "মেহেনী" প্রভৃতি লোকনাট্য সম্পর্কেও আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই সব নয়, উৎসবে বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫টির মতো লোকনাট্য পালার অভিনয়ের আয়োজনও করা হয়েছে। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। প্রত্যাশ্যা বাংলা লোকনাট্যের এই আলোচনাচক্র আমাদের অনেক কৌতূহলের নিরশন ঘটাবে। আপাতত শুধু প্রতীক্ষার পালা।

‘লোক সংস্কৃতির উ



সুন্দরবন অঞ্চলের লোকনাট্য বনবিবি পালার একটি দৃশ্য



মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি -উৎসবের প্রধান



দার্জিলিং

রনপা নৃত্যের একটি দৃশ্য





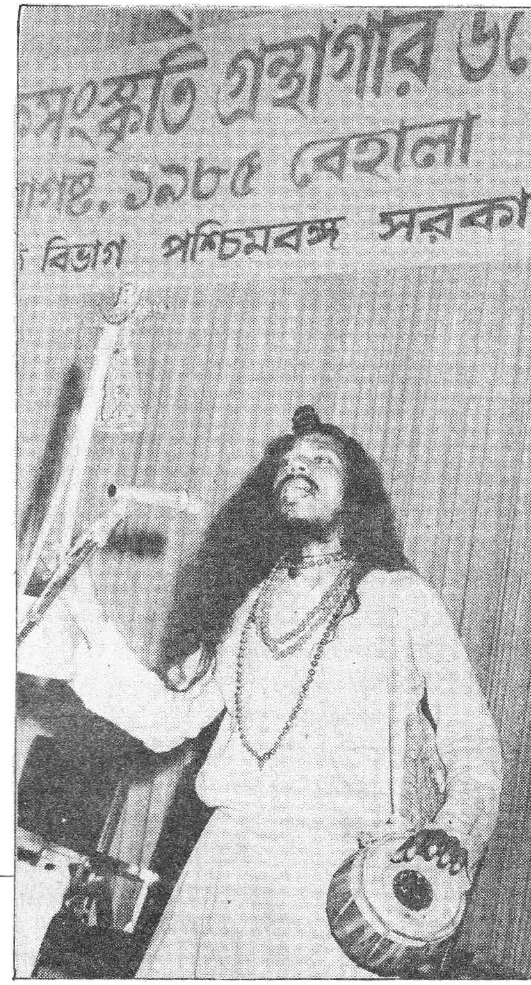
ৎসব ১৯৮০–'৮৫



তোরণ



রায়বেঁশে লোকনৃত্যের একটি অংশ



বেহালায় লোকসংস্কৃতির রাজ্য গ্রন্থাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাউল গান



লোকসংস্কৃতির উৎসবে সত্যপীরের গান



মেদিনীপুরে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি উৎসবে একজন মহিলা কবিয়াল

ভূমি-সংস্কার ও লোক-শিল্পী

–শ্রী মানিক সরকার

পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্য গীতনাট্য বাদ্য এবং চারুকারু মৃৎ দারু শিল্পের শিল্পীদের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক অনেকটা রক্তমাংসের সম্পর্কের মতো। অপেশাদারী লোকশিল্পীদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে যুক্ত।

১৯৮০-৮১ তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ লোক সংস্কৃতির পর্ষদের পরামর্শ অনুসারে লোক সংস্কৃতির একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিলেন। তার প্রাথমিক প্রতিবেদন ইতিমধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।তাতে উল্লেখ আছে, পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্য, লোকগীত, লোকনাট্য, এবং লোকশিল্পের যথাক্রমে ১,৪৮১ জন, ১,১৬০ জন, ৩৫২ জন এবং ৮৮ জন শিল্পী ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেন, ৩,০৮১ জন মোট শিল্পীর মধ্যে মূল জীবিকা হিসাবে কৃষির সঙ্গে ১,৭১১ জন যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ক্ষেত মজুর ১,২৬৫ জন (৭০.৬৪), নিজ চাষের প্রান্তিক কৃষক ৪৩৪ জন (২৪.২৩), বর্গাদার ১২ জন [৫.১৩] ছিলেন।

কৃষি জমির পরিমাণ, তার উৎপাদিত ফসল এবং ফসল থেকে আয় দিয়ে কৃষক সমাজের আর্থিক স্তর বিন্যাস করা হয়। কৃষকদের মধ্যে বৃহৎ জোতদার, ধনী কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক, গরিব কৃষক, বর্গাদার, পাট্টাদার, ক্ষেতমজুর প্রমুখ রয়েছেন। তাই, সকল কৃষকের স্বার্থ সর্বক্ষেত্রে এক নয়। জোতদার এবং ক্ষেতমজুরের কৃষিক্ষেত্রে অবস্থান এক বিন্দু বা এক বৃন্তে নয়।

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের মধ্যেও মধ্যবিত্ত মধ্যকৃষক, গরিব কৃষক, বর্গাদার ক্ষেতমজুর রয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, উপরে প্রদত্ত তথ্য লোকশিল্পীদের মধ্যে ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বেশি। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, লোকশিল্পীদের মধ্যে গ্রামের কোন জোতদার এবং ধনী কৃষককে দেখা যাচ্ছে না। ৩,০৮১ জন শিল্পীর মধ্যে কোন জোতদার বা কোন ধনী কৃষক ছিলেন না। প্রদত্ত তথ্য, লোকশিল্পীদের শ্রেণী চরিত্রের দ্যোতক কিনা তা ভেবে দেখার মতো। ক্ষেতমজুররাই গ্রামীণ সমাজে গ্রামীণ সর্বহারা।

শিল্পের আর্থিক স্তর বিন্যাস নেই। কিন্তু শিল্পীর আর্থিক স্তর ভেদ অতীতেও ছিল,বর্তমানেও আছ। শিল্পীর এই আর্থিক স্তর ভেদ তার শিল্প কৃতিকে প্রভাবিত করে কিনা, করলে কতটা করে কিভাবে করে তা অনুধাবনের বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ফুল্লরার বারমাস্যা' গানটি একজন দরিদ্র গ্রামীণ লোকশিল্পী যে সহজ, সরল, বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, তা কোন ধনী ঘরের পেশাদারী শিল্পী পারবেন কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়।

নৃত্যগীত নাট্যবাদ্য ও শিল্পে পেশাদার সৃষ্টি ধনতন্ত্রেরই অবদান। ধনতান্ত্রিক প্রথার গর্ভেই এর উদ্ভব। এঁদের সৃষ্ট শিল্প পণ্যরূপেই ধনতান্ত্রিক প্রথায় বিবেচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগেই এর প্রতি আলোকপাত করেছিলেন।

ধনতন্ত্র ভারতের গ্রামীণ জীবনে প্রবেশ করছে। ধনতান্ত্রিক বিধানে সমগ্র ভারত একটি 'অখন্ড বাজার'। এই 'বাজারে' লোকগীতও বিক্রি হচ্ছে, যদিও পরিমাণে কম। লোকশিল্পীদের মধ্যে 'পেশাদারী' হবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে কোন কোন শাখায় 'মজুরী প্রথার' উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু এটাই কি সমাধান?

না। লোকশিল্পীদের বৃহত্তর অংশ কৃষি এবং ভূমি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। ভূমি কৃষি অর্থনীতি ভারতের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমূল ভূমি সংস্কারের সঙ্গে লোকনৃত্যগীতনাট্যবাদ্যও শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশ ও প্রসার যুক্ত হয়ে আছে। দেশের আমূল ভূমি সংস্কার যত দ্রুত কৃষক সমাজের উদ্যোগে সুসম্পন্ন হবে, তত দ্রুত দেশের সমগ্র আর্থিক চরিত্র পরিবর্তিত হবে। দেশের গোটা আর্থিক চরিত্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারের পটভূমিতেই অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে। আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের অবসান এবং মৌলিক ভূমিসংস্কারের সঙ্গে লোকনৃত্যগীত নাট্য ও বাদ্য শিল্পের বিকাশ এবং তার শিল্পী সমাজের উন্নত জীবন ও জীবিকার স্বার্থ জড়িত।

তার জন্য মৌলিক ভূমিসংস্কার এবং সমগ্র সমাজকে নতুন করে পুনর্গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিক নরনারীর নবজাগরণের যে তরঙ্গ উঠছে, তার মধ্যে লোকশিল্পীদের তাঁদের ঐতিহ্যময় মহৎ সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন।

এবং কৃষক সমাজের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিকেও দেশের লোকনৃত্যে গীতনাট্যবাদ্য ও শিল্পের এবং তার শিল্পীদের প্রতি দায়দায়িত্ব বহন করা দরকার। (দ্রষ্টব্য– 'পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পী ও কৃষক সমাজ, দৈনিক বসুমতী, ২৯ মার্চ, ১৯৮৪)।



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফাদিকার একজন দুঃস্থ লোকশিল্পীকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন

রাজা মানসিং
গৌড়-বঙ্গ
সে রাজা মানসিং
হৈল

॥ কবিত্ব লাভের ইতিবৃত্ত ॥

বিষ্ণুপদাম্বু
উৎকল-অধিপ॥
কালে। প্রজার পাপের
রিণ॥

['চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু ব্যাধের জন্মভূমি]

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর রাঢ় অঞ্চলের কান্দী মহকুমার বড়ঞা থানার গোলাহাট গ্রাম ও ফুল্লরার বারমাস্যার লীলাভূমি কুলি গ্রাম থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মভূমি দক্ষিণ রাঢ়ের দামুন্যা গ্রাম পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই যাত্রা শেষ হবে মধ্যযুগের জীবনবাদী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে। 'ভারতচন্দ্র মেলা'র ৪র্থ দিনের অনুষ্ঠানে। মধ্য যুগের কাব্য চেতনার পথ বেয়ে আধুনিক কালে উত্তরণের যে বিভিন্ন প্রয়াস তার সঙ্গে যোগসূত্র রচনাই এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য। এই পদযাত্রা উপলক্ষে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'কবিত্বলাভের ইতিবৃত্ত' পরিচ্ছেদটির আধুনিক গদ্যরূপ প্রকাশিত হল। সম্পাদক 'পশ্চিমবঙ্গ'।]

'শোন ভাই সভাজন,' এই গীত (চণ্ডীমঙ্গল) যেভাবে রচিত হল তার বিবরণ। দেবী চণ্ডী হঠাৎ মাতার বেশ ধারণ করে কবির শিয়রে এসে অবতীর্ণ হলেন।

সেলেমাবাজ শহরে সজ্জন নিয়োগী গোপীনাথের বাস। তাঁরই তালুক দামিন্যায় আমি কৃষি কাজ করি। সেখানেই আমাদের সাত পুরুষের ভিটা।

গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের অধিপতি রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি বিষ্ণুপাদপদ্মে নব-ভৃঙ্গস্বরূপ। কিন্তু মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার (গ্রামপ্রধান) হলেন মামুদ সরীফ, রায়জাদা হলেন উজীর। তাঁদের অত্যাচারে ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়ে গেল, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হল। রাজকর্মচারীরা প্রজার সকাতর আবেদন উপেক্ষা ক'রে পনের কাঠায় বিঘার পরিমাণ ঠিক ক'রে কোনাকুনি দড়ি ফেলে জমির মাপ নির্ধারণ করল। সরকারি লোকজন অনুর্বর জমিকে উর্বর ব'লে চিহ্নিত করে বেশি খাজনা ধার্য করে, উপকার না করেই ঘুষ নেয়। পোদ্দার এই সুযোগে টাকায় আড়াই আনা কম দিতে লাগল এবং প্রতিদিন ট্যাকাপিছু একপাই সুদ নিতে আরম্ভ করল। ডিহিদার এমনই একগুঁয়ে যে ঘুষ না দিয়ে প্রসন্ন হয় না। গোরু, ধান প্রভৃতি কেনারও লোক নেই।

আমার প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে পড়ে বন্দী হলেন, পরিত্রাণের কোন উপায় নেই প্রজারা পাছে পালিয়ে যায় সেজন্য প্রতি দরজায় পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে প্রজারা ব্যস্ত হয়ে ঘরের যা-কিছু ছিল এক টাকার জিনিষ দশ আনায় বেচে দিতে লাগল।

চণ্ডীবাটী গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ সহায় ছিল, তাই গম্ভীর খাঁ-র সঙ্গে যুক্তি করে ভাই রমানাথকে সংগে নিয়ে দামুন্যা ছাড়লাম। পথে চণ্ডী দর্শন দিলেন।

ভালিয়ায় পৌঁছানর পর রূপ রায় সব টাকাকড়ি নিয়ে নিল। যদু কুণ্ডু নিজের ঘরে ঠাঁই দিয়ে আমাকে রক্ষা করল এবং তিনদিনের ভিক্ষা দিল।

মুড়াই নদীর তীর ধ'রে ভগবানের নাম নিয়ে কোনক্রমে দেউট্যায় এসে পৌঁছালাম। সেখান থেকে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে পাতুলিতে এসে গঙ্গাদাসের কাছে সাহায্য পেলাম। তারপর নারায়ণ, পরাশর ও আমোদর নদী পার হয়ে গোচড়্যা নগরে পৌঁছালাম। তেল ছাড়াই স্নান সমাপন করতে হল, জলপান করে উদরপূর্তি করতে হল। কিন্তু শিশুপুত্র খিদের জ্বালায় কান্নাকাটি আরম্ভ করল।

পুকুরের পাড়ে আসন করে শালুকের ডাঁটা দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা করলাম। পথশ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে যখন নিদ্রাচ্ছন্ন তখন দেবী চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিয়ে গীতরচনার আদেশ দিলেন।

আরড়া বা ব্রাহ্মণভূমির ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায় আমার কবিত্বের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে দশ আড়া ধান দিলেন। নিজ পুত্রদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে নিয়োজিত করলেন। তাঁর পুত্র রূপে গুণে খ্যাত রঘুনাথ আমাকে গুরু বলে পূজা করলেন। ডামাল নন্দী সর্বদা আমার যত্ন করত। রঘুনাথ রাজা হলে তাঁর অনুমতি অনুসারে কবিকঙ্কণ এই গীত রচনা করেন।

(গদ্যরূপ: অশোক কুণ্ডু)

(৫৭১ পৃষ্ঠার পর)

লোক সংস্কৃতি উৎসব এবং যাত্রা উৎসব

লোকপ্রিয় সহজ সরল সংস্কৃতি মাধ্যমের বিকাশ ও উন্নতি আমরা কামনা করি। যদিও ব্যবসায়িক কারণে এরমধ্যে হয়তো স্থূল ও পশ্চাদপদ সামন্তবাদী ধ্যানধারণার উপাদান লক্ষ্য করা যাবে কিন্তু সামগ্রিক বিচারে লোকশিক্ষায় এর অবদান আজও অনস্বীকার্য। যে সাংস্কৃতিক মাধ্যম সম্পর্কে ব্যাপক সাধারণ মানুষের আকর্ষণ রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে তার উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা করা আমাদের কর্তব্য। তাই আমরা যাত্রা উৎসব সংগঠিত করে থাকি এই দায়িত্ববোধ থেকে। আগামী ১০ থেকে ৩১ জানুয়ারি '৮৬ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে বসবে বাইশদিন ব্যাপী এক বিরাট যাত্রার আসর।

দ্বিতীয় রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবের অব্যবহিত পরেই হবে এই উৎসব। রাজ্যের সুনির্বাচিত ও জনপ্রিয় ছাব্বিশটি যাত্রা সংস্থা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবে। রবিবার ও ছুটির দিন দুপুর ও সন্ধ্যায় এবং অন্যান্যদিন সন্ধ্যায় পালাগুলি পরিবেশিত হবে। সামাজিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, জনশিক্ষামূলক কাহিনীর সম্ভারে এবং শক্তিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-নৈপুণ্যে এই উৎসব আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য সুরুচিকর পরিবেশ ও দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হবে।

উপসংহার: আমাদের সাংস্কৃতিক নীতির লক্ষ্য—"শতফুল বিকশিত হোক"।

সৃষ্টির অঙ্গনে তা সে শহরে বা গ্রামে যেখানেই হোক বিপুল যে ধারায় ও বৈচিত্র্যে শিল্প সৃজন হয়ে চলেছে, তার জীবনমুখী ও সমান কল্যাণময় প্রবাহকে জনজীবনে বিস্তৃত করে দেওয়া আমাদের ঘোষিত নীতি। শহরের মানুষ রসগ্রাহী জনগণ লোকশিল্প যাত্রা উৎসবের সুস্থ ধারাস্নানে, আগামী সমগ্র জানুয়ারী মাস ব্যাপী নিজেদের স্নাত করবেন—এই আমাদের প্রত্যাশা। লোকশিল্প ও আঙ্গিকের রসগ্রহণের এই সুযোগ সকলে গ্রহণ করবেন এ আমাদের বিশ্বাস। আসুন—শিল্পী, দর্শক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত উদ্যোগ ও অংশগ্রহণে আগামী রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব এবং যাত্রা উৎসব সার্থক ও সফল করে তুলুন। [বেতার ভাষণ]

লোকসংস্কৃতির রাজ্য উৎসব উপলক্ষে

লোকনাট্য বিষয়ক আলোচনা সভা

৫-৭ জানুয়ারি, ১৯৮৬

স্থান: কলিকাতা তথ্য কেন্দ্র, আর্ট গ্যালারি (দ্বিতল) সময়: ২ টা

প্রবন্ধ পাঠে: অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক, অধ্যাপক সুধীর করণ, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক নির্মলকুমার দাশ, মানিক সরকার, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক দিগ্বিজয় দেসরকার, শ্রী রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীনৃপেন সাহনা, অধ্যাপক গিরিজাশংকর রায়, শ্রী শম্ভুনাথ মাণ্ডি, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শিবপদ ভৌমিক, অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ, অধ্যাপক পুষ্পজিৎ রায় প্রমুখ।

কমেন্টেটর: অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুবোধ বসুরায়, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক অনিমেষ পাল, অধ্যাপক সনৎ মিত্র, শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গোপাল সাহা, শ্রী সুনীল পাল, অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, শ্রী সুনীল সাহা, অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য, শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ আমন্ত্রিত হয়েছেন।

লোকশিল্পের প্রদর্শনী

৪-৮ জানুয়ারি ১৯৮৬

স্থান: 'নন্দন' প্রদর্শনীকক্ষ



লোকশিল্পীদের পদযাত্রা

৪ জানুয়ারি ১৯৮৬

সকাল ৭-৩০ মিনিট

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্র সদনে উৎসব প্রাঙ্গণে শেষ হবে।



সাঁওতালী শিল্পীদের নিয়ে লোকনাট্যের ওয়ার্কশপের একটি অংশ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কয়েকটি দিক

শ্রীদীনেশ রায়

গত ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার লগ্নীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রই প্রাধান্য পেয়েছে, এবং তার দরুন যোজনা অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সপ্তম যোজনার অপর কয়েকটি দিকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সপ্তম যোজনার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যোজনা কমিশন ধরে নিয়েছে, ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে সঞ্চয় ২৩.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৪.৫ শতাংশ হবে। এর অর্থ, যোজনাকালে সঞ্চয়ের প্রান্তিকহার হবে ২৮.৪ শতাংশ, অর্থাৎ অতিরিক্ত ১০০ টাকা মোট জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি) হলে, ২৮.৪ টাকা সঞ্চিত হবে।

কিন্তু বিগত ১০ বছরের সঞ্চয় হার অনুশীলন থেকে দেখা যাবে, জি ডি পি-র অনুপাত হিসাবে মোট আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কার্যত অপরিবর্তিতই আছে।

জি ডি পি-র শতাংশ হিঃ মোট আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়

১৯৭৫-৭৬	২০.১
১৯৭৬-৭৭	২২.৫
১৯৭৭-৭৮	২২.২
১৯৭৮-৭৯	২৪.৬
১৯৭৯-৮০	২২.৯
১৯৮০-৮১	২২.৮
১৯৮১-৮২	২২.১
১৯৮২-৮৩	২২.৮
১৯৮৩-৮৪	২২.৬
*১৯৮৪-৮৫	২৩.৩

১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত-ভারত সরকার, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৮৪-৮৫; * যোজনা কমিশন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৮৪-৮৫)-সঞ্চয় সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তার সাথে উপরিউক্ত পরিসংখ্যানের কিছুটা অমিল আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আলোচ্য রিপোর্টে (পৃঃ ১০) দেখানো হয়েছে-মোট আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনুপাত ১৯৮২-৮৩ সালে ছিল ২৩.১ শতাংশ, ১৯৮৩-৮৪ সালে ২২.০ শতাংশ, ১৯৮৪-৮৫ সালে ২২.৬ শতাংশ।

যাই হোক না কেন, আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং যোজনা কমিশনের তথ্যগুলিরই ব্যবহার করছি।

দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে সঞ্চয়ের অনুপাত মোটামুটি ২২ শতাংশের ধারে কাছে রয়ে গেছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১০০ টাকা জি ডি পি প্রতি ২২ টাকা সঞ্চিত হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পাঁচ বছরে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের ব্যাপক প্রয়াস সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা চলেছে।

ষষ্ঠ যোজনাকালে চলতি মূল্যমান অনুযায়ী ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য খরচ হয়েছে; ১৯৭৯-৮০ সালের মূল্যমান অনুযায়ী এই খরচ ৯৭,৫০০ কোটি টাকা (সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা; খন্ড১, পৃঃ ৫০)। ষষ্ঠ যোজনায় ১০,৬৮৪ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ষষ্ঠ যোজনাকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আর্থিক সংকটের দরুন রূপায়িত করা যায় নি। উদাহরণ হিসাবে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্ষমতা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ষষ্ঠ যোজনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল ১৯,০০০ মেগাওয়াট, কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টির প্রকৃত পরিমাণ ১৪,০০০ মেগাওয়াট মাত্র। অনুরূপভাবেই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য ঘোষিত ক্ষুদ্র লক্ষ্যগুলিও পূরণ হয় নি।

সপ্তম যোজনার জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর সম্পদ কোথা থেকে আসবে? সপ্তম যোজনার খন্ড ১ (পৃঃ ৫২)-তে আছেঃ-

(কোটি টাকা হিঃ)

অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	৪৪,৭০২
বৈদেশিক ঋণ	১৮,০০০
ঘাটতি ব্যয়	১৪,০০০
রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত থেকে	৩৫,৪৮৫
মোট	১,১২,১৮৭ কোটি টাকা

অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের অর্থ অতিরিক্ত কর আরোপের মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সার্মগ্রিকভাবে লোকসানে চলছে-এই ক্ষেত্র থেকে যদি সম্পদ সংগ্রহ করতে হয় তা হলে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির দাম আরও বাড়াতে হবে। যেমন কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাত, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতির দাম আরও বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপ ভাবেই ঘাটতি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করবে। তাছাড়া প্রতি বছরই রেল ভাড়া ও মাসুল বাড়ানো হচ্ছে।

এত করেও সপ্তম যোজনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ পাওয়া যাবে কী না সে সম্পর্কে যোজনা কমিশন নিশ্চিত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং যোজনা কমিশন সম্পদ সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য রাজ্যগুলির উপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে যোজনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় হ্রাস করার কথা বলেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয় বেড়েই চলেছে।

১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যমান অনুযায়ী, ১৯৮৫-৯০ সালের মধ্যে (পাঁচ বছরে) যোজনা-বহির্ভূত খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খরচ হবে ১,৫০,৪১৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে আছে সুদপ্রদান খাতে-৪৬,২২২ কোটি টাকা; ভর্তুকি-১৬,৮৭৫ কোটি টাকা; প্রতিরক্ষা-৪৫,০০০ কোটি টাকা; অন্যান্য উন্নয়নবহির্ভূত রাজস্ব ব্যয় ৩৬,৯১১ কোটি টাকা।

আমরা বলছি, ইউনিয়ন সরকারের উন্নয়ন-বহির্ভূত খাতে খরচের গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। আমরা মনে করি এই পর্যালোচনা করলে, এমন অনেক খরচ ধরা পড়বে যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে-দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় বলা হয়েছিল, উন্নয়নবহির্ভূত ব্যয় একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় যোজনায় সুপারিশ করা হয়েছিল যে, উন্নয়নবহির্ভূত খাতে ব্যয় ১৯৫৬ সালের পর যাতে আর না বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কিন্তু তা হয়নি। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে উন্নয়ন-বহির্ভূত ব্যয়ের হার উন্নয়নমূলক ব্যয়ের তুলনায় দ্রুতহারে বেড়েছে ও বাড়ছে।

প্রতিবছর যে কর ফাঁকি যাচ্ছে তার এক-চতুর্থাংশও যদি ব্যয়ের আওতায় আনা যায় তাহলেও প্রতি বছর কয়েক সহস্র কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য পাওয়া যাবে। কিন্তু বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের শাসকদল এ পথ গ্রহণে প্রস্তুত নয়।

তাছাড়া বিত্তবান শ্রেণীগুলির উপর আরও অনেক নতুন নতুন প্রত্যক্ষ কর আরোপের সুযোগ আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত নয়। ১৯৮৫-৮৬ সালের কুখ্যাত এবং জন-বিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটেই তার প্রমাণ মিলেছে।

দেশে প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদের কোন অভাব নেই। অভাব হলো, সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত আহরণের এবং উন্নয়নের কাজে লাগাতে অনিচ্ছা এবং এই অনিচ্ছার কারণও রাজনৈতিক। আমরা মনে করি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার জন্য যে ১,৮০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বরাদ্দ করা সম্ভব।

ষষ্ঠ যোজনার চার বছরে (১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৩-৮৪) বেসরকারি ক্ষেত্র ৮০,০১৪ কোটি টাকা লগ্নী করেছে (রাজ্যসভা, প্রশ্নোত্তর, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৫)। কিন্তু কিভাবে এই আর্থিক সম্পদ সংগৃহীত হলো, কোথায় এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লগ্নী করা হলো, প্রশ্নোত্তরের মধ্যে তার কোন বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নি। এই বিরাট অঙ্কের লগ্নী সত্ত্বেও ষষ্ঠ যোজনাকালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ৪.৫ শতাংশ মাত্র, যদিও লক্ষ্য ছিল ৮ শতাংশ।

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীগুলি এমন সমস্ত ক্ষেত্রে লগ্নী করেছে যেখানে কম লগ্নী করেও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছি যে, বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সরকার নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে অনিচ্ছুক।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ৮ শতাংশ নির্দিষ্ট করেছে (ষষ্ঠ যোজনাতেও একই লক্ষ্য ছিল)। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনের দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি বৃহৎ ক্ষেত্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। আমরা মনে করি, সপ্তম যোজনায় ঘোষিত শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষুদ্র (৮ শতাংশ) লক্ষ্যও পূরণ হবে না।

শিল্প ক্ষেত্রে সংকট চরমে উঠেছে এবং এই সংকট সৃষ্টি করেছে বৃহৎ শিল্পপতিরা; কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেল (৩ ডিসেম্বর, ১৯৮০) এখন লক-আউট ঘোষিত ও বন্ধ চটকলের সংখ্যা ৯ যার মধ্যে ৮টিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, পশ্চিমবঙ্গে ৩টি চটকল চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

একই প্রশ্নের উত্তর থেকে আরও জানা গেল, এখন লক-আউট ঘোষিত ও বন্ধ বস্ত্রমিলের সংখ্যা ৮৩, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ৭।

এই দুটি শিল্পে ১,৩৬,৫৭০ জন শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

বন্ধ ও লক-আউট ঘোষিত চটশিল্প ইউনিট (বেকারে পরিণত শ্রমিক সংখ্যা)

১) আসাম কো-অপারেটিভ	১০০০
পশ্চিমবঙ্গ	
২) প্রেমচাঁদ	২০০০
৩) নস্করপাড়া	২৫০০
৪) শ্রীরাম	৯১৫
৫) গৌরীশংকর	২৩০০
৬) নর্থ ব্রুক	৩৭০০
৭) এম্পায়ার	১৯০০
৮) মেঘনা	৬১০০
৯) বালি জুট	৪০০০

(রাজ্যসভা প্রশ্নোত্তর, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫)।

পশ্চিমবঙ্গে যে বস্ত্র মিলগুলি বন্ধ বা লক-আউট ঘোষিত, সেগুলি হলো:-

পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ ও লক-আউট ঘোষিত বস্ত্র মিলগুলিতে শ্রমিক সংখ্যা

১) বঙ্গোদয় কটন মিলস্	৮৩৭
২) ইন্ডিয়া লিনো লিডার্স লিঃ (ভিক্টোরিয়া ডিভিশন)	১১৩৫
৩) শ্রীহনুমান কটন মিলস্	১২৪৫
৪) ময়ূরাক্ষী কটন মিলস্	৬২৫
৫) শক্তিগড় টেক্সটাইলস্	১৭৩০
৬) জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি (কটন মিলস্)	২৩৭৫
৭) বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ (স্টেপল ফাইবার ডিভিশন সূক্ষ্ম একক)	২৮৩৮

এখন দেশে রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের সংখ্যা প্রায় ৮৮,০০০। এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সংসদে রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলি সম্পর্কে যে বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হলো তাতে শিল্প রুগ্ণতা রোধ করা যাবে না। এই আইন বেকারত্বের প্রসার ঘটাবে বলে আমাদের আশংকা। সংসদে বিলটি নিয়ে আলোচনাকালে বিরোধী সদস্যগণ, বিশেষ করে বিরোধী বামপন্থী সদস্যগণ এই আশংকাই ব্যক্ত করেছেন।

যোজনার সাথে সম্পর্কযুক্ত আর একটি বিষয়ের উপর এখানে আলোকপাত করা প্রয়োজন; বিষয়টি হলো-পাইকারী মূল্যের হিসাবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ভোগ্য দ্রব্যের দরসূচীর হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির হার। সরকারি পরিসংখ্যান নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পরিসংখ্যানও মুদ্রাস্ফীতির গভীরতা ও ব্যাপকতা উদ্‌ঘাটিত করে:-

পাইকারি মূল্যসূচি (বার্ষিক গড় বৃদ্ধি অথবা হ্রাস (-) ১৯৭০-১০০ শতাংশ হিঃ)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা(১৯৫১-৫৬)	(-) ২ ৭
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (১৯৫৬-৬১)	৬.৩
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (১৯৬১-৬৬)	৫.৮
তিনটি বার্ষিক যোজনা	
১৯৬৬-৬৭	১৩.৯
১৯৬৭-৬৮	১১.৬
১৯৬৮-৬৯	(-)১.২
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (১৯৬৯-৭৪)	৯.০
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (১৯৭৪-৭৯)	৬.৩
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (১৯৮০-৮৫)	৯.৩

(রাজ্যসভা প্রশ্নোত্তর, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৫)

দেখা যাচ্ছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পাঁচ বছরে পাইকারী মূল্য বার্ষিক ২.৭ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই হ্রাসের হার ছিল .৯ শতাংশ। অন্যান্য যোজনাকালে পাইকারি মূল্য বৃদ্ধির হার অব্যাহত ছিল। ষষ্ঠ যোজনাকালে পাইকারি মূল্য বার্ষিক ৯.৩ শতাংশ হারে বেড়েছে। ষষ্ঠ যোজনার পাঁচবছরে পাইকারি মূল্য ৪৮.৫ শতাংশ বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতির এই ক্রমবর্ধমান চাপ উন্নয়নমূল কর্মকান্ডের প্রক্রিয়াকেও ব্যাহত করেছে।

১৯৬০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে, ১৯৮০-৮৪ সালের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ভোগ্যদ্রব্যের দরসূচি ৫২.৫ শতাংশ বেড়েছে (রাজ্যসভা, প্রশ্নোত্তর, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫)।

এটা সরকারি হিসাব; বেসরকারি হিসাবে দরবৃদ্ধির পরিমাণ অন্ততঃ ৭০ শতাংশ। ১৯৮৫ সালেও ভোগ্যপণের দরবৃদ্ধির গতি অব্যাহত আছে।

ভোগ্যদ্রব্যের দরের সূচক সংখ্যার হিসাবে টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্যতম একটি প্রধান বৈশিষ্ট

১৯৬০ সালে টাকার ক্রয়ক্ষমতা ছিল ১০০ পয়সা। তারপর থেকে টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে চলেছে ঃ

১৯৬১	৯৬.১৫ পয়সা
১৯৬৫	৭২.৯৯ পয়সা
১৯৭০	৫৪.৩৫ পয়সা
১৯৭৫	৩১.১৫ পয়সা
১৯৮০	২৫.৬৪ পয়সা
১৯৮৪	১৭.৩৬ পয়সা
১৯৮৫ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর)	১৬.৬৪ পয়সা

(সূত্র: একই)

অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ অবিরাম বলে চলেছেন যে তাঁরা মুদ্রাস্ফীতির গতি রোধ করেছেন।

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা

আলোচনাচক্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী

গত ১৭ ডিসেম্বর মালদা জেলার মানিকচক পঞ্চায়েত ভবনে 'ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা বিষয়ক এক আলোচনাচক্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে জেলার তথ্য দপ্তর। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসুশীল সিংহ। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী সিংহ বলেন, যে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মতো বীভিষিকাময় ও নারকীয় ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্যে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। স্থানীয় শিক্ষক শ্রীশেখ আখতার হোসেন তাঁর বক্তব্যে তথাকথিত ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী দেশগুলি যেভাবে নিজেদের ব্যবসাকে কায়েম করার জন্য জঘন্য অমানবিক ঘটনার জন্য যারা দায়ী তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এভাবে যাতে আর পরিবেশ কলুষিত না হয় সেজন্য আমাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি এবং প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে।



মানিকচকে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

গ্রামীণ সংবাদ

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৫ পাটিত কৃষক সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীদীনবন্ধু মোহান্তি। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রী তারাপদ চক্রবর্তী ও পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করে-জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্রীমোহান্তি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষাকে গণমুখী করে তুলতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার ব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রসারে গ্রন্থাগারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার গণমুখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার-ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই কারণে গ্রন্থাগারকে গণশিক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জেলা পরষিদ সহ-সভাধিপতি, পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় বক্তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতি ব্যাখ্যা করে বক্তব রাখেন।

মুলকি কুড়মালী ভাখি বাইসি পশ্চিমবঙ্গ শাখার তৃতীয় অধিবেশন

ঝাড়গ্রাম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে ১৫ ডিসেম্বর বেলা ১টা থেকে মুলকি কুড়মালী ভাখি বাইসি পশ্চিমবঙ্গ শাখার তৃতীয় অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৩৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতে বিগত অধিবেশনের সিদ্ধান্তক্রমে সংস্থার মুখপত্র "ফুরুং"-এর প্রথম সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে "ফুরুং" মাসিক পত্রিকা হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রিকার সম্পাদক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতো। সম্পাদকমন্ডলীতে নির্বাচিত হন সর্বশ্রী সুনীল মাহাতো, কিরীটি মাহাতো (পুরুলিয়া), বিজয় মাহাতো, গুণধর মাহাতো (ঝাড়গ্রাম)। প্রকাশনার দায়িত্বে যামিনী মাহাতোকে (শিল্পদা) নির্বাচিত করা হয়। বিগত সভার সিদ্ধান্তক্রমে সংস্থার সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ মাহাতো জানান, মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালী ভাষার পঠন-পাঠনের জন্য এবং আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে কুড়মালী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারের দাবিতে গণস্বাক্ষরিত আবেদন ইতিমধ্যেই পেশ করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকের মাধ্যমে যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উক্ত দপ্তরের অধীনে কুড়মালী ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্রে চালু করা হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিপত্র পেশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ঝাড়গ্রাম এলাকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীললিত মোহন মাহাতো।

সুসংহত প্রচার অভিযান

বিগত '৭৮ সালে নতুন করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কাজে পঞ্চায়েতগুলি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও বন্যা, খরা বা মহামারীর মত আপৎকালীন সমস্যার মোকাবিলাতেও গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলির সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তবু সার্বিক গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতগুলি সঠিক কী ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে এখনও বহু বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্রয়োজন রয়েছে আলোচনার।

এই উদ্দেশ্যেই ১২ ডিসেম্বর বনগাঁ মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও গাইঘাটা সামগ্রিক উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায় সামগ্রিক উন্নয়ন পর্ষদের হলে " গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েত" শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় বহু স্থানীয় জনসাধারণ ছাড়াও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, একাধিক অঞ্চল প্রধান ও জেলাপরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার সূত্রপাত করে মহকুমা তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর পরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী সত্য কপাট বলেন, বিগত আমলে পঞ্চায়েতের সঙ্গে পঞ্চায়েতগুলির মৌল পার্থক্য হলে যে, আগের আমলের পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা ছিল অনেক সীমিত। সেই তুলনায় বর্তমানের পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের পরিধি ও ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি। এছাড়াও '৭৮ সালের পরে থেকেই পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সবথেকে নিচে গ্রামপঞ্চায়েতগুলির কাজ করার সুযোগ অনেক বেড়েছে। তিনি অবশ্য এই পঞ্চায়েতগুলোর মাধ্যমে আরও বেশি কাজকর্ম করানোর সপক্ষে দাবি জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রামের বিভিন্ন ঝগড়া-কাজিয়া মেটানোর ব্যাপারে পঞ্চায়েতগুলির আইনগত অধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অবিলম্বে ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকরী করার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

জলেশ্বর-১ গ্রাম প্রধান শ্রী অখিল দাস তাঁর ভাষণে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে ঋণ মঞ্জুরকারী বিভিন্ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেন। ইছাপুর-২ গ্রাম প্রধান শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন যে, ১৯৭৮ সালের পর বামপন্থী পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে কাজে ত্রুটি থাকলেও অধিকাংশ প্রতিনিধিই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে গত কয়েক বছরে এই রাজ্যে ভূমি সংস্কারে পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের উল্লেখ করেন। চাঁদপাড়া গ্রাম প্রধান শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর বক্তব্যে পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মকে ত্বরান্বিত করতে প্রশাসনকে আরও তৎপর হওয়ার অনুরোধ রাখেন।

সভাপতির ভাষণে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী নারায়ণচন্দ্র সরকার বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলি গ্রামোন্নয়নে কী জাতীয় ভূমিকা পালন করছে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে আগের আমলে পঞ্চায়েতগুলির আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বরাদ্দ অর্থের প্রায় পুরোটাই ব্যয় হত দফাদার আর চৌকিদারদের মাইনে দিতে। তিনি বলেন যে, বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত হলেও এদের হাতে আরও আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দিলে গ্রামোন্নয়নের কাজ তরান্বিত হবে।

এছাড়াও এইদিনের আলোচনা সভায় গাইঘাটা সামগ্রিক উন্নয়ন পর্ষদের উপ-অধিকর্তা, এই সংগঠনের একাধিক কর্মী এই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত একাধিক জেলা পরিষদ সদস্য পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

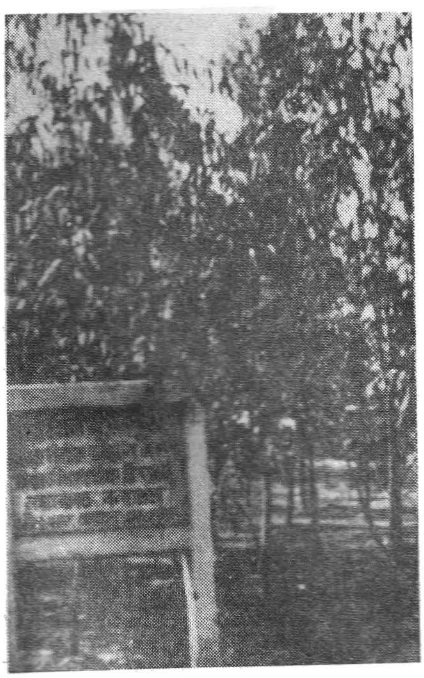
আলোচনাচক্র ছাড়াও গাইঘাটা সামগ্রিক উন্নয়ন পর্ষদ প্রদর্শিত "জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক পোস্টার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও মহকুমা তথ্য দপ্তর থেকে সন্ধ্যেবেলায় একাধিক সরকারি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

রজনীকান্ত মাইতি জন্মজয়ন্তী

গত ২০ নভেম্বর এগরার রজনীকান্ত জ্ঞানমন্দিরের উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী প্রয়াত রজনীকান্ত মাইতির ৭৬তম জন্মদিবস উপলক্ষে "মানব ইতিহাসে কাঁথি মহকুমার স্থান" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কাঁথি মহকুমার ভূতাত্ত্বিক গঠন ও মানব ইতিহাসে তার প্রভাব এবং কাঁথির মাটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক উপমাদানের সংগৃহীত নিদর্শনের ভিত্তিতে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন যথাক্রমে শ্রীকানাইলাল আদক ও শ্রী অরবিন্দকুমার মাইতি। সংস্থার সহসভাপতি শ্রী গোষ্ঠবিহারী ভানা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়া এই উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'মানবপ্রগতিতে সংগ্রহশালা' বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন শ্রীদীপঙ্কর মাইতি সুদীপ মাইতি দ্বিতীয় এবং অনুপম আদক সান্ত্বনা পুরস্কার পান।



তমলুকে সমাজ ভিত্তিক বন সৃজন

বর্তমান পরিস্থিতিতে জমি ও পরিবেশের সঙেগ সামঞ্জস্য রেখে বন সম্পদ সৃষ্টি করে গ্রামের মানুষের জীবন যাপনের মান উন্নত করাই সমাজ ভিত্তিক বন সৃজনের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৮১ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙেগ সমাজ ভিত্তিক বন সৃজনের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে জ্বালানী কাঠের ও গবাদি পশু খাদ্যের সরবরাহ বাড়ান এবং একই সঙেগ গরীব চাষীদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর করা ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা। মেদিনীপুর জেলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৮৩ সালে।

এই প্রকল্পে ১৯৮৩-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কার্যের খতিয়ান।

১৯৮৩ সালের ফার্ম ফরেস্ট্রির মডেল ৯(এ) এবং ৯(বি) এর মোট পাঁচটি নার্শারীতে ২৩৮০০০ চারা এবং এন, আর ই পি স্কীমের চারটি নার্শারীতে ১,০০০০ চারা ও দুটি স্কুল নার্শারীতে ২৬,০০০ চারা মোট ৩,৬৪,০০০ আকাশমণি, ঝাউ, ইউকেলিপটাস, সুবাবুল, ডাবুল, মেহেগিনি, শিশু, চারলা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ইত্যাদি বিলি করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ফার্ম ফরেস্ট্রির মডেল ৯(এ) এবং ৯(বি) এর সাতটি নার্শারীতে ৩,৬০,০০০ চারা ও নন্দীগ্রাম ৩, মহিষাদল১, তমলুক ১ মোট তিনটি ব্লক নার্শারীতে ২,৮০,০০০ চারা বিলি করা হয়েছে। ঐ তিনটি ব্লক নার্শারীর চারার মধ্যে ১,০০০ করে নারিকেল চারা ও ৩০ আম, জাম, লেবু, সুপারি, জামরুল, আমলকি ইত্যাদি ফলের চারা গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ফার্মে ফরেস্ট্রির মডেল ৯(এ) এবং ৯(বি) এর ছয়টি নার্শারীতে ২,৬৯,০০০ চারা এবং তমলুক ১, মহিষাদল ১, ময়না ১, নন্দীগ্রাম ১ ও ৩নং ব্লকের পাঁচটি ব্লক নার্শারীতে ৪,৪০,০০০ চারা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লক নার্শারীতে ১,৪০০ নারিকেল চারা ও ২৫% ফলের চারা গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ১৯৮৩-১৯৮৫ সাল তিনি বৎসরে ফার্ম ফরেস্ট্রির মডেল ৯(এ) এব ৯(বি) এর প্রতিটি নার্শারীতে চারা পিছু ৫০ গ্রাম করে সার ও সুবাবুল, বাবলা, আকাশমনির মিনিকিটের প্যাকেট ও জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে।

বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য বনজ সম্পদ বাড়াতে নদীর পাড়ে, খালের ধারে রাস্তার ধারে ১৯৮৩-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ৪,৩১,৫০০ চারা গাছ রোপণকরা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৪১ নং জাতীয় সড়কে ৭৪,০০০, রাজ্য সড়কে ৪০,০০০, এইচ টি ক্যানেলের পাড়ে ১,০৪,০০০ চারা তমলুক এ ডি এম বিল্ডিং এর সামনে ১,৫,০০ চারা হলদী নদীর পাড়ে ১৬,০০০, হলদিয়াতে ৪,০০০ এবং মেচেদা হাওড়া রেল লাইনের পাশে ও বিভিন্ন ব্লকের রাস্তার পাশে চারা লাগানো হয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মেচোদা-দীঘা রাজ্য সড়কের দুই পাশে সমাজ ভিত্তিক বন সৃজনের কর্মসূচি সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। ইউকেলিপটাস ঝাউ, সুব্যবুল, আকাশমনি, বাবালা, শিরিষ ইত্যাদি গাছে সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় সুন্দর বনাঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের আগ্রহের ফলেই এই সব প্রয়োজনীয় বন সম্পদ অসংরক্ষিত অবস্থার মধ্যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয় রোধের স্থায়ী ব্যবস্থার নিশ্চত করেছে।

মহকুমা তথ্য দপ্তর থেকে জন মানুষের সাড়া জাগানোর জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে এই সম্পর্কীয় ৭টি আলোচনা চক্র এবং ২টি বড় সেমিনার সংগঠিত করেছেন। প্রতিবেদনটির প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী বনসৃজন বিভাগের সঙেগ আলোচনা করে মহকুমা তথ্য অফিসের ফিল্ড ওয়ার্কার শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র শীট মহাশয় সংগ্রহ করেছেন।

এই কর্মসূচির ব্যপক প্রসারের জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগী সংস্থার প্রতিনিধি বৃন্দ বা ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনে তমলুক রেঞ্জ অফিস বা খড়্গপুর ডিভিসানাল ফরেস্ট অফিসের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

মেয়েদেরই অগ্রণী ভমিকা নিতে হবে

পশ্চিমবঙেগর উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ আজ ২০ ডিসেম্বর চন্দননগরে ইন্সটিটিউট অব এ্যাডুকেশন ফর উইমেন এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনাচক্র ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে জাতীয় সার্বিক কল্যাণের জন্য স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ঘটানো খুবই জরুরি। মেয়েদেরই স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

শতবর্ষের আলোকে জলপাইগুড়ি পৌরসভা

১৮৮৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি পৌরসভা গঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে ২ ফেব্রুয়ারি শত বৎসর পূর্ণ হয়। পৌরসভার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর মোট তিন দিন ব্যাপী জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে বিভিন্ন আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

পৌরসভার শতবর্ষ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত পর্যটক আবাসটি উদ্বোধন করেন শ্রী প্রশান্ত শূর। রেসকোর্স পাড়ায় একটি বাজার ও অফিসের শিলান্যাস করেন শ্রী নির্মল বসু।

১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচ ঘটিকায় ১০০ টি প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর "ক্ষুদ্র শহরে উন্নয়নের সমস্যার" উপর বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের স্বায়ত্ত শাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী নির্মল বসু এবং সেচ ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী ননী ভট্টাচার্য ও স্থানীয় ও নগর উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার প্রমুখ।

১৭ ডিসেম্বর "পরিবেশ দূষণ ও স্থানীয় করলা নদীর" বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায়। সেচ ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী ননী ভট্টাচার্য ও মৎস্য মন্ত্রী শ্রী কিরণময় নন্দ, ও প্রাক্তন লোকসভার সদস্য ও উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রী উপেন্দ্র নাথ বর্মন প্রমুখ।

অনুরূপ ১৮ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিল্প উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনার উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

উক্ত তিন দিন জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজবংশী, মেচ, রাভা, নেপালী ও দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ির পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিদিন প্রায় ১,০০০ দর্শক উক্ত নৃত্যগীত উপভোগ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য জেলা তথ্য দপ্তর সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

উন্নয়নের পথে কাটোয়া পৌরসভা

উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকজীবনের স্বাচ্ছন্দবিধানই কাটোয়া পৌরসভার একমাত্র লক্ষ্য একথা জানালেন কাটোয়ার পৌরপতি শ্রীশশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলার কৃষিনির্ভর মহকুমা কাটোয়া। অজয় ও ভাগীরথী নদী বেষ্টিত এই মহকুমা শহর কাটোয়া। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলা সংলগ্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই প্রাচীন শহরের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এছাড়া ব্যবসা বা বাণিজ্যপুষ্ট এই শহরের নানা প্রয়োজনে প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন আরো হাজার দশেক মানুষ। পৌরকর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের যে চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, গত ৮ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের অর্থানুকূল্যে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫টি। মেটাল রোড ৭.৩৮ কিলোমিটার থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ১১ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। শহরের কাঁচা গলিপথগুলিতে ইট বিছানো হয়েছে। গলিপথের অন্ধকার দূর করার জন্য বসানো হয়েছে নতুন নতুন আলোর স্তম্ভ। সুপরিকল্পিতভাবে তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য বাসগৃহ এবং নতুন পয়ঃপ্রনালী নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাজে খরচ পড়েছে চার লক্ষ টাকার মত। প্রশাসনিক কাজে চাপ বৃদ্ধির জন্য পৌরভবনকে সম্প্রসারিত করার হয়েছে। নতুন করে নির্মাণ করতে হয়েছে স্বাস্থ্য ও জলসরবরাহ বিভাগের কার্যালয়। শহরে তিনটি উদ্যান, একটি সুদৃশ্য বাস-টার্মিনাল এবং শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রায় এককোটি টাকা ব্যয় করে একটি রিং বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বহু আকাঙ্খিত টাউন হল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহর উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। চারটি বড় সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। উচ্ছেদ হওয়া হকারদের জন্য ৩২টি ঘর সমন্বিত একটি বাজার নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। অনুরূপ আরো ৩২টি স্টল নির্মাণে করা হবে। নির্মিত হবে একটি অতিথিশালা। শহরের খাটা পায়খানা স্যানিটারি পায়খানার রূপান্তরিত করার কাজ শুরু হয়েছে। তিনটি নতুন বাজার, একটি ট্রাক টার্মিনাল, ছোট ছোট শিল্পসৃষ্টির জন্য একটি শিল্পাঞ্চল তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি শহরের উপকন্ঠে অপরিকল্পিত বাড়ি, ঘর, বাজার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার মোট ৩.৩৭ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ৮ বছরে পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কাটোয়া শহরের নাগরিকজীবনে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

শিলিগুড়িতে নতুন বাজার

গত ১৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি সুভাষপল্লী রবীন্দ্রনগর রথখোলা বাজারের আনুষ্ঠানিক-ভাবে শিলান্যাস করেন রাজ্যের নগর উন্নয়নমন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর বলেন, ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উত্তর ভারতে ৪৭ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন। তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করেছেন এবং ফরিদাবাদের মত একাধিক শিল্পকেন্দ্রও গড়ে তুলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিও অনুরূপভাবে সুনজর দিতেন তাহলে কখনই পশ্চিমবঙ্গে একের ছয় শতাংশ মানুষ হকারে পরিণত হতেন না।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে দশ থেকে বারো বছর কোনো পৌর নির্বাচনই হয়নি। সেই সময় পৌর খাতের সব অর্থই কলকাতা এবং হাওড়ার জন্য ব্যয় হত। সেই পুরনো আইন সংশোধন করে এখন রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা এবং ব্লক স্তরে উন্নয়নের দিকে এই সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যে কুড়িটি শহরের জন্য কেন্দ্রের সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহর তার অন্যতম। এখন প্রতিটি শহরের জন্য যে এক কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, এই যে বাজারের শিলান্যাস করা হল, এর জন্য খরচ হবে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

শ্রী প্রশান্ত শূর আরো বলেন, শিলিগুড়ি পৌরসভার অধীনস্থ প্রতিটি ওয়ার্ডেই একটি করে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হবে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে একটি পাইলট স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দুটি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কাজ শেষ হবে। সেই সঙ্গে পুরনো ডিপ টিউবওয়েল সম্প্রসারণ করা হবে। এর জন্য মোট খরচ হবে প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ওয়ার্ড বৃদ্ধির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্ড বৃদ্ধি জরুরী। শিলিগুড়িতে আগে যেখানে ১৯ টি ওয়ার্ড ছিল এখন সেখানে ৩০ টি ওয়ার্ড করা হয়েছে।

জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া স্থগিত

৩১ তম জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়া, শীতকালীন প্রতিযোগিতা, অংশ-১ ও ২ আগামী ১ থেকে ৮ জানুয়ারি ১৯৮৬ পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরার ছা-মনুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পোস্টার প্রদর্শনী

প্রত্যন্ত অঞ্চল ছা-মনু গাঁও সভার পঞ্চায়েত অফিস ও পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত ১৫ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর এই তিন দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আগরতলা দপ্তর একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

গ্রাম ত্রিপুরার অত্যন্ত দুর্গম স্থান এই ছা-মনু। এই ধরনের গ্রামের লোক বেশির ভাগ নিরক্ষর পত্র-পত্রিকা তাই ওই সব অঞ্চলে বিশেষ কাজে আসে না। চলচ্চিত্র এবং পোস্টার তাই এঁদের কাছে প্রিয়। পোস্টারের বিষয়বস্তু বলে দিলে ছবির সংগে মিলিয়ে এঁরা খুব সহজে বুঝতে পারেন আমাদের পোস্টার প্রদর্শনীও তাই এঁদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে যাঁরা লেখাপড়া কিছু কিছু জানেন তাঁদের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য একটি খাতায় ধরে রাখা হয়েছে

প্রদর্শনীটি ১৫ নভেম্বর বেলা তিনটেয় ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যকরী সদস্য শ্রীকামিনী দেববর্মা উদ্বোধন করেন উদ্বোধনকালে ত্রিপুরার তথ্য অধিকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

তিনদিনে প্রায় দেড় হাজার লোক অত্যন্ত উৎসাহের সংগে এই প্রদর্শনী দেখেছেন।



উত্তর ত্রিপুরার ছা-মনু গাঁও সভার পঞ্চায়েত অফিস ও পাঠাগার উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগরতলাস্থিত পশ্চিমবঙ্গ তথ্যকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধক ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যকরী সদস্য শ্রীকামিনী দেববর্মা প্রদর্শনী দেখছেন।

সম্প্রসারিত কাটোয়া



পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত

যাত্রা উৎসব

১০ থেকে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৬

স্থান ঃ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিঃ, রবিবার ও ছুটির দিন ২টো ও ৬টা ৩০ মিঃ

তারিখ	দলের নাম	পালার নাম	পরিচালক / শ্রেষ্ঠাংশে
১০.১.৮৬	নব নাট্যতীর্থ	চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র	শেখর গাঙ্গুলী, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী
১১.১.৮৬	গণবাণী	পাগলা ডাক্তার	নিরঞ্জন ঘোষ, মহুয়া চ্যাটার্জী
১২.১.৮৬ (দুপুর)	নাট্য কোম্পানী	শ্যামের বাঁশরী	মনোজ মিত্র, রাখি হালদার
(সন্ধ্যা)	তারা মা অপেরা	মাকে মনে পড়ে	ইন্দ্র লাহিড়ী, কাজল মুখার্জী
১৩.১.৮৬	নিউ প্রভাস অপেরা	পাগলা ঘন্টা	পান্না চক্রবর্তী, লক্ষ্মী হালদার
১৪.১.৮৬	নিউ বিশ্বরূপ যাত্রা সংস্থা	ভাঙাগড়া	স্বপন কুমার, পদ্মিনী
১৫.১.৮৬	অগ্রগামী	সাঁঝের সানাই	বীণা দাশগুপ্ত, মনোজ কুমার
১৬.১.৮৬	ভারতী অপেরা	কালো মেঘের কান্না	অনাদি চক্রবর্তী, লীলা চক্রবর্তী
১৭.১.৮৬	রানার যাত্রা ইউনিট	বধূর চিতা জ্বলছে	কুমার ইন্দ্রনীল, স্বপ্না সেন
১৮.১.৮৬	তপোবন নাট্য কোম্পানী	শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ	দুলাল চট্টোপাধ্যায়, গীতাঞ্জলি ব্যানার্জি
১৯.১.৮৬ (দুপুর)	নট জাগরণী যাত্রা ইউনিট	নীরব সাক্ষী	প্রশান্ত কুমার, স্নিগ্ধা চৌধুরী
(সন্ধ্যা)	তরুণ অপেরা	সুরা নারী সিংহাসন	শান্তিগোপাল
২০.১.৮৬	নব অম্বিকা নাট্য কোং	শাহী সুলতানা	শিবানী ভট্টাচার্য, রাজা ভট্টাচার্য
২১.১.৮৬	গন্ধর্ব অপেরা	শ্রীরাধা	ছন্দা চ্যাটার্জি
২২.১.৮৬	শ্রীদুর্গা অপেরা	শত্রু	অসিত বসু, সীমা সরকার
২৩.১.৮৬ (দুপুর)	মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সমাজ	মা তুমি দেবী	নির্মল মুখার্জি, মীনাকুমারী
" (সন্ধ্যা)	নব রঞ্জন অপেরা	সীতার শূন্য সিঁথি	তপন কুমার, সোমাশ্রী ঘোষ
২৪.১.৮৬	আর্য অপেরা	গরিবের মেয়ে.	দিলীপ রায়, সঞ্চয়িতা
২৫.১.৮৬	সত্যনারায়ণ অপেরা	বড়দিদি	দ্বিজু ভাওয়াল, জয়শ্রী মুখার্জী
২৬.১.৮৬ (দুপুর)	কৃষ্টি সংসদ, মেদিনীপুর	তেলেঙ্গানা	সুরজিৎ মজুমদার, দীপ্তি পালোধি
" (সন্ধ্যা)	সত্যম্বর অপেরা	দেবী সন্ন্যাসিনী	শক্তি ভট্টাচার্য, দেবিকা
২৭.১.৮৬	মজুরী অপেরা	সাথীহারা	তপন ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা রায়
২৮.১.৮৬	মোহন অপেরা	পাতাল ভৈরবী	উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, মিতা চ্যাটার্জি
২৯.১.৮৬	লোকনাট্য	কলিযুগের বউ	নবকুমার, মীনাক্ষী দে
৩০.১.৮৬	যাত্রালোক	বাগদি পাড়ার বউ	তপন গাঙ্গুলী, শর্মিলা পাল
৩১.১.৮৬	জনতা অপেরা	লক্ষ্মীর পদচিহ্ন	বেলা সরকার, দেবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিঃ দ্রঃ—৪ জানুয়ারী থেকে সিজন টিকিট ও ৭ দিনের অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাবে

সিজন টিকিট : ১০০ টাকা

দৈনিক টিকিট : ৫, ৭, ও ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : রবীন্দ্রসদন কাউন্টার ও যাত্রা প্রাঙ্গণ (১২ থেকে ৮টা)

অনুষ্ঠান শেষে বাসের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে

আই সি এ-২৮ (৮)/৮৬



মোষের দুধ পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ সরবরাহের অন্যতম সূত্র। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও সহায়তায় পল্লীর দুগ্ধ উৎপাদনকারীরা এখন প্রচুর দুগ্ধদায়ী মোষ পালনে এগিয়ে আসছেন।

ফটো ঃ রতন দাশগুপ্ত

লোক সংস্কৃতি
দ্বিতীয় রাজ্য উৎসব-১৯৮৬

৪-৮ জানুয়ারি '৮৬

প্রত্যহ বিকাল ৫-৩০ মিনিট

রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ
কলকাতা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সূচি

৪ জানুয়ারি, শনিবার □

দার্জিলিং	□ ভারতীয় নেপালী, ভুটিয়া এবং লেপচা নৃত্যগীত
২৪ পরগনা	□ বনবিবি (লোকনাট্য), তরজা গান, অষ্টক গান
হাওড়া	□ কৃষ্ণযাত্রা (লোকনাট্য), ঢোলবাদ্য
বাঁকুড়া	□ কাঠি নাচ, মনসার গান

৫ জানুয়ারি, রবিবার □

পুরুলিয়া	□ ছৌনৃত্য, নাটুয়া নৃত্য, ঝুমুর গান, মাছানী (লোকনাট্য)
কোচবিহার	□ বিষহরির গান, ভাওয়াইয়া গান
হুগলি	□ ওরাওঁ নৃত্যগীত, দুলাল রায়ের কীর্তন
মুর্শিদাবাদ	□ আলকাপ (লোকনাট্য)
জলপাইগুড়ি	□ কুশান গান (লোকনাট্য)

৬ জানুয়ারি, সোমবার □

মালদহ	□ গম্ভীরার গান, ডোমনী গান (লোকনাট্য), মুখাখেল
মুর্শিদাবাদ	□ বাউল, ফকিরি গান, শব্দ গান, মুসলিম বিয়ের গান, বোলান গান, ঢোলবাদ্য
জলপাইগুড়ি	□ ধামগান (লোকনাট্য), মেচনৃত্যগীত, নিবারণ পন্ডিতের লোকগীত

৭ জানুয়ারি, মঙ্গলবার □

পশ্চিমদিনাজপুর	□ চৈতা গান, খন গান (লোকনাট্য)
মেদিনীপুর	□ কবি গান (মহিলা), পটের গান, সাঁওতাল ও মুন্ডারী নৃত্য, টুসু গান, পাইকনৃত্য
বর্ধমান	□ মনসার ঝাপান গান, ভাদু গান, ছাদ পেটান গান

৮ জানুয়ারি, বুধবার □

নদিয়া	□ পুতুল নাচ, ধুয়োজারি, বঁদ গান, ঢোলবাদ্য
বীরভূম	□ লেটো গান (লোকনাট্য), বাউল [মহিলা], আদিবাসী পটের গান, □ সাপুড়ের গান, রায়বেঁশে নৃত্য
জলপাইগুড়ি	□ রাভা নৃত্যগীত

অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠান-সূচির পরিবর্তন মার্জনীয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটিড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত